প্রথম প্রকাশ
দ্বিতীয় মুদ্রণ
১ জানুয়ারী, ১৯৩৭

প্রকাশক
ডঃ পঞ্চানন সাহা
সাধারণ সম্পাদক
ইন্দো-জি. ডি. আর মৈত্রী সমিতি
২৭-জি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

মুদ্রক
ফ্রেন্ডশিপ প্রিন্টার্স
২৭-জি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

সম্পাদকের নিবেদন

১৯৪৭ সালের ৩০ অক্টোবর অ-মার্কিনী কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, বিচারকদের প্রশ্নের জবাবে, আত্ম-পরিচয় ঘোষণা করে বলেছিলেন : 'আমি একজন নাট্যকার এবং কবি'।

সেই বিশ্ববন্দিত নাট্যকার ও কবি বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট-এর সৃজনশীল প্রতিভা দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে, একটু দেরীতে হলেও, এ-দেশের অগণিত নাট্যামোদী এবং শিক্ষিত পাঠকের মননক্রিয়ায় আগ্রহ সানন্দে স্বীকৃত। অন্তত বিগত এক দশক বাঙলার প্রগতিশীল নাট্যমঞ্চে ব্রেখ্‌ট যে সম্রাটের মহিমায় অধিষ্ঠিত, একথা অনস্বীকার্য। নাট্যকার ব্রেখ্‌ট-এর সঙ্গে কবি ব্রেখ্‌টও যে অবিচ্ছেদ্য এক মানস-মণ্ডলের অধীশ্বর; একই উৎসের ভিন্নমুখী সৃজনধর্মী উৎক্ষেপণ-ক্রিয়ায় অভিন্ন ব্যক্তিত্ব, কাব্য-সংকলনের মাধ্যমে সেই সত্যও আজ প্রতিষ্ঠিত।

প্রকৃতপক্ষে, নাট্যকার ব্রেখ্‌ট হলেন ক্রান্তদর্শী কবি ব্রেখ্‌ট-এরই সমাজ-বাস্তবতা প্রকাশের ও নিপীড়িত মানবাত্মার আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, ঘৃণা-ভালোবাসা, ন্যায়-অন্যায়, জয়-পরাজয় প্রকাশের অন্যতর রূপ। এক কথায়, শিল্পে তাঁর অন্বিষ্ট ছিল, তাঁরই ভাষায় : 'সামাজিক দ্বন্দ্বকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা'। তাঁর নাট্য-দ্বন্দ্বে এই চিন্তা-চৈতন্য যেমন প্রতিফলিত, তেমনি নাটকের মধ্যে প্রয়োজন মতো কবিতা এবং কবিতার মধ্যে নাটকীয় সংলাপ সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ভিন্নতর শিল্পক্রিয়া। তা কখনো অলংকার-বর্জিত শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে; কখনো নৈর্ব্যক্তিক আনন্দবেদনায় আশ্চর্য কাব্য-সৌন্দর্যে উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরে ও সুরে উচ্চারিত।

ইন্দো-জি. ডি. আর মৈত্রী সমিতির পক্ষে প্রকাশিত এবং প্রখ্যাত কবিদের দ্বারা অনূদিত ব্রেখ্‌ট-এর কবিতার এই সংকলন-গ্রন্থের পাঠকেরা আমাদের এই উপলব্ধিকে গ্রহণ বা বর্জন যাই করুন না কেন; ব্রেখ্‌ট-এর মানবমহিমাদীপ্ত কণ্ঠস্বরকে তাঁরা চিনতে যে ভুল করবেন না, এই বিশ্বাস আমরা পোষণ করি।

প্রসঙ্গত; অন্য দু-একটি কথা বলাও প্রয়োজন বোধ করছি। জন্মসূত্রে ব্রেখ্‌ট ছিলেন জার্মান এবং পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক জার্মানির নাগরিক। ইন্দো-জি. ডি. আর মৈত্রী সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংগঠন নিরবচ্ছিন্নভাবে ভারত ও গণতান্ত্রিক জার্মানির মানুষের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধনকে সুদৃঢ় করায় প্রচেষ্টা যেমন চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি দুই দেশের ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক বন্ধনকেও শক্তিশালী করার কাজে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইন্দো-জি.ডি.আর মৈত্রী সমিতি মনে করে, এইভাবেই আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সংহতির সেতু বন্ধন রচনা করা আজকের পৃথিবীতে সকল মানুষেরই অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

এই কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে সমিতি চায় গ্যয়টে, হাইনে প্রমুখ কালজয়ী প্রতিভাধরদের রচনাবলীর সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা আনা সেগার্স, বের্টোল্ট ব্রেখ্ট প্রমুখের মানবপ্রেমে সমুজ্জ্বল সংগ্রামী ঐতিহ্যকেও এ-দেশের মানুষের কাছে পরিবেশন করতে।

বস্তুত, ইন্দো-জি.ডি.আর মৈত্রী সমিতি তার সীমিত শক্তি নিয়ে দীর্ঘকাল এই কাজটি করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ব্রেখ্ট-চর্চার ইতিহাসে সমিতির ভূমিকা আমরা অন্তত গর্বের সঙ্গেই স্মরণ করতে পারি। যতদূর জানি, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক-পদে ইস্তফা দিয়ে সাংবাদিকপ্রবর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৪১ সালে যখন 'অরণি' পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন তাঁর সম্পাদিত ঐ পত্রিকার প্রথম বর্ষের একটি সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় বের্টোল্ট ব্রেখ্ট-এর ফ্যাসিবাদবিরোধী নাটকের অনুবাদ। তারপর দীর্ঘকাল পরে পশ্চিমবঙ্গের যেসব শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী এবং নাট্যকর্মী ব্রেখ্ট-কে সাময়িক বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বিনীতভাবেই বলতে পারি, মৈত্রী সমিতির নাম তাঁদের সকলের সঙ্গেই সমভাবে উচ্চারণযোগ্য। এই সংকলন গ্রন্থের সব কবিতাই সংগৃহীত হয়েছে মৈত্রী সমিতির মুখপত্র 'ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি. ডি. আর'-এ প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতা থেকে। পাঠকেরা যদি গ্রন্থটিকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেন তবে ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও 'কবিতা-সংকলন' প্রকাশের জন্য আমরা তৎপর হতে পারি।

অনুবাদকবৃন্দ প্রায় প্রত্যেকেই স্বনামধন্য। তাই অনুবাদ-কর্মের ভালো-মন্দ বিচারের ভার কাব্য-পাঠকের উপর ন্যস্ত করেই আমরা নিশ্চিন্ত। এই প্রসঙ্গে পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিবেদন: অধিকাংশ কবিতাই ইংরেজী ভাষা থেকে অনূদিত। শুধুমাত্র কয়েকটি কবিতা সরাসরি মূল জার্মান থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এগুলির অনুবাদক জার্মান ভাষা-শিক্ষার খ্যাতিমান শিক্ষক ও ছাত্র যথাক্রমে শ্রীযুক্ত শান্তিশেখর সিংহ, অমল মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন বাগ, সুব্রতনারায়ণ চৌধুরী ও অনুপ সাহা। আর, শ্রীযুক্ত সিংহ কর্তৃক অনূদিত দুটি কবিতাকে ছন্দোবদ্ধ করার কাজে সাহায্য করেছেন কবি তরুণ সান্যাল।

যেসব কবি-অনুবাদক এবং বন্ধু-সহকর্মী এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে ইন্দো-জি. ডি. আর মৈত্রী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ পঞ্চানন সাহা-র অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও নিরন্তর সহযোগিতা ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করা যে সম্ভব হতো না, এই কথাটাও মুক্তকণ্ঠেই আমি স্বীকার করছি।

নিবেদন ইতি—
ধনঞ্জয় দাশ

ইন্দো-জি. ডি. আর মৈত্রী সমিতি
২৭-জি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০
প্রজাতন্ত্রদিবস, ১৯৮[illegible]

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে

'ব্রেষ্‌ট-এর কবিতার' প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বলা যায়, অনধিক ছয় মাসের মধ্যেই সেই প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়েছে। বাঙলার ব্রেষ্‌ট-অনুরাগী পাঠকদের কাছে আমরা সত্যিই তাই কৃতজ্ঞ। ব্রেষ্‌ট-এর মানবমহিমাদীপ্ত কণ্ঠস্বরকে তাঁরা চিনে নিতে যে এতটুকু ভুল করেন নি, এটাই আমাদের পরম সান্ত্বনা এবং গর্বেরও কথা বটে।

যাহোক, একটু দেরিতে হলেও এবার 'ব্রেষ্‌ট-এর কবিতা'-র দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হচ্ছে। এই মুদ্রণে অনেকগুলি নতুন কবিতা আমরা পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আশাকরি ইণ্ডো-জি. ডি. আর মৈত্রী সমিতির এই বিনীত প্রয়াসে পূর্বের মতোই তাঁদের সহৃদয় সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ব্রেষ্‌ট-এর কবিতা'-র আলোচনা প্রসঙ্গে সহৃদয় সমালোচক, কবি-বন্ধু সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত 'ব্রেষ্‌ট'-এর উচ্চারণ ও বানান নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, 'ব্রেশ্‌ট' বানানই উচ্চারণের দিক দিয়ে যথাযথ।

আমি ভাষাবিদ নই। জার্মান ভাষাও আমার অনায়ত্ত। তবু 'ব্রেষ্‌ট'-এর বানান নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা আমাকেও করতে হয়েছে। চলতি বানান—ব্রেখ্‌ট, ব্রেশ্‌ট, ব্রেস্‌ট, ব্রেষ্‌ট—এর কোনটা গ্রহণ করা উচিত, এই জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি কয়েকজন বিশেষজ্ঞেরও দ্বারস্থ হয়েছিলাম। গণতান্ত্রিক জার্মানির দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কাছে শুনেছি, তাঁদের দেশেও উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলে 'ব্রেষ্‌ট'-এর উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তাই 'খ' ও 'শ'-এর দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য আমরা বহুদর্শী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর একটি প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে 'ব্রেখ্‌ট' বা 'ব্রেশ্‌ট'—এর কোনোটিই সঠিক উচ্চারণ নয়। এই দুটির মাঝামাঝি 'ষ' উচ্চারণই অনেক পরিমাণে সঠিক। সুতরাং আমরা 'ব্রেষ্‌ট' লেখাই সঙ্গত মনে করি।

এরপরেই বলা যায়, নামে যেমন কিছু যায়-আসে না, তেমনি বিদেশী শব্দের উচ্চারণ নিয়ে খুব বেশি মাথা না ঘামালেও চলে। আসলে, সাহিত্যের ভোজে লেখক যদি আমাদের পরিতৃপ্ত করে থাকেন তবে সেটাই তো চরম প্রাপ্তি। কবি-নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেষ্‌ট বাঙালি মননকে আনন্দ-বেদনায় আর সংগ্রামী চেতনায় নিত্যদিন রসসিক্ত ও উজ্জীবিত করে চলেছেন, এর চেয়ে বেশি কাম্য আর কি হতে পারে? এই সংকলনটিকে পাঠকেরা সেই মনোভাব থেকে গ্রহণ করলেই আমরা খুশি হব।

নমস্কারান্তে—

ধনঞ্জয় দাশ

ইণ্ডো-জি.ডি.আর মৈত্রী সমিতি

২৭-জি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

১ জানুয়ারি, ১৯৮২

সূচীপত্র

গলদ

হিংস্র এক শকট তোমার ট্যাঙ্ক,
হে সেনানী !
অরণ্য করে ধ্বংস
আর শত জনকে করতে পারে দলিত।
কিন্তু একটিই তার ত্রুটি,
চালাবার কেউ তার চাই।
মহাবল তোমার বোমারু বিমান,
হে সেনানী !
ঝড়ের চেয়ে বেগে পারে উড়তে,
বইতে পারে হাতীর চেয়ে বেশী বোঝা।
একটি শুধু তার খুঁত,
মিস্ত্রী একজন তার দরকার।
মানুষ বড় কাজের জীব,
হে সেনানী !
উড়তে পারে, হত্যাও পারে করতে।
এই শুধু তার গলদ
সে ভাবতে পারে।

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

উপহার

সৈনিক বধূ অবাক, খুললো মোড়া,
নজর পাঠায় প্রাচীন শহর প্রাগ্ !
উঁচু খুর-ওলা জুতো এ-যে এক জোড়া—
অবাক করলে পুরানো শহর প্রাগ্ !

সৈনিক বধূ মোড়া খোলে চুপি চুপি
সাগর পারের অসলো পাঠালো কিবা ?
পাঠিয়েছে স্বামী সরেশ লোমের টুপি—
ফূর্তিতে হাসে আর্য শিবের শিবা।

সৈনিক বধূ অবাক নয়নে দেখে,
এমস্টারডাম পয়সার দেশ বটে,
হীরার আংটি পাঠাল সেখান থেকে—
সাদা চামড়ায় মানাবে তা বেশ বটে।

সৈনিক বধূ অবাক হয়েই থাকে,
ব্রাসেল্‌স শহর বড়ই সে শৌখিন !
দামী দামী লেস্‌ ব্রাসেল্‌স পাঠায় ডাকে-
কিবা সাজগোজ চলবে সারাটা দিন !

সৈনিক বধূ বিস্মিত, ভাবে বামা,
প্যারিসের আলো চক্ষু জ্বালায় তার
ফ্যাশান-স্বর্গ পাঠাল রেশমী জামা—
চরম এ শখ জেগেছে কত না বার !

সৈনিক বধূ সুখে ভাবে চোখ বুজে
বুখারেস্ট থেকে ব্লাউস যে উপহার,
পাঠায় আবার স্বামী তার খুঁজে খুঁজে
নকশার কাজ, রঙের কি যে বাহার !

নাৎসির বৌ আবার অবাক চেয়ে—
তুষার-কঠিন রাশিয়ার উপহার !
বিধবার কালো ঘোমটা পাঠাল কে ও
তুষার-কঠিন রাশিয়ার উপহার !*

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

* বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট-এর একটি কবিতা অবলম্বনে রচিত।

ভাবীকালের মানুষদের কাছে

সত্য বটে আমি আছি অন্ধকার যুগে।
অকপট কথা আজ অদ্ভুত শোনায়। আজ প্রসন্ন মুখের অর্থ
নির্মম হৃদয়। আজ যে হাসতে পারে
সে বুঝি বা শোনেনি এখনও
ভীষণ সব সংবাদ।
আমাদের এ কী যুগ!
যখন গাছপালার কথা বলা প্রায় একটা অপরাধ
কারণ তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তো একরকম নীরবতাই বটে।
আর আজ পথে-ঘাটে যে লোক চলতে পারে শান্ত, স্থিরভাবে,
সত্যিই সে আছে তার দুঃস্থ অসহায়
বন্ধুদের নাগালের বাইরে।
কথাটা সত্যি যদি বলো : আমি খেটে খাই,
কিন্তু সেটা নিতান্তই একটা দৈবাৎ ঘটনা!
আমার জীবিকা যাই হোক, তাতে আমার বাঁচার অধিকার বর্তায় না।
বেঁচে থাকাটাই একটা আকস্মিক ব্যাপার (কপাল যদি ভাঙে
তবেই গিয়েছি)।
ওরা বলে : খাও-দাও। খুশি থাকো খেতে দিতে পাচ্ছ।
কিন্তু কী করেই বা সুখে খাই-দাই
যখন আমার অন্ন ক্ষুধার্তের মুখ থেকে ছিনিয়ে জোগাড় করা
যখন আমার জলের গেলাশে তৃষিতের অধিকার!
তবু খাই-দাই।
আমিও তো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হতে চাই ;
প্রাচীন পুঁথিতে লিখেছে প্রজ্ঞা কি বস্তু :
বিশ্বের যা কিছু দ্বন্দ্বময় তার থেকে দূরে থাকো,
কাটাও তোমার আয়ুটুকু
কাউকে ভয় না ক'রে,
হিংসা প্রয়োগ বিনা,
যা সৎ ফিরিয়ে দাও অসৎকে হাতবদলে ;

আকাঙ্ক্ষার তুষ্টি নয়, বিস্মৃতিকে
প্রজ্ঞার সাধন—
এর কিছুই আমার সাধ্য নয় !
সত্য বটে, আমি আছি অন্ধকার যুগে।
শহরে আমার আসা বিশৃঙ্খলার সময়ে
যখন ক্ষুধাই রাজা।
মানুষের মধ্যে আমার আসা যে গণ-উত্থানের লগ্নে,
আর আমিও বিদ্রোহী।
তাইতো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।
আমার খাওয়া সারতে হয়েছে হত্যাকাণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে,
আমার ঘুমের উপরে পড়েছে খুন-খারাবির ছায়া,
আমার প্রেমের মধ্যে তাইতো এসেছে ঔদাসীন্য।
নিজের স্বভাবে আমি বোধ করেছি অধৈর্য।
তাইতো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।
আমাদের কালে পথের শেষ হয় চোরাবালিতে।
আমার বাকশক্তিই আমায় ধরিয়ে দিয়েছে কসাইদের হাতে।
অল্প আমার ক্ষমতা। কিন্তু আমি না থাকলে
শাসকেরা আরো নিশ্চিত হতো। এই অন্তত ছিল আমার আশা
তাইতো ফুরিয়ে গেল আমার সময়
মর্ত্যে যেটুকু আমার ভাগে ছিল।
তোমরা যারা বেরিয়ে আসবে এ বন্যা থেকে
যাতে আমরা ডুবছি
ভেবে দেখো,
যখন তোমরা আমাদের দোষত্রুটি হিসাব করবে, তখন
ভেবো এই অন্ধকার যুগের কথাও
যার জঠরের ব্যথায় এর জন্ম।
কারণ আমরা দেশ পাল্টিয়েছি জুতার পাটির চেয়ে বেশীবার।
বাধ্য হয়ে, শ্রেণী সংগ্রামে, মরিয়া ব্যথায়,

যখন অন্যায় ছিল, ছিল না তার প্রতিরোধ।
কারণ আমরা ভালোই জেনেছিলুম
দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণায় ললাট হয়ে ওঠে
নির্মম কঠিন ঃ
অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে রাগ
তাতেই কণ্ঠ হয়ে ওঠে কর্কশ। হায়রে! আমরা
যারা প্রাণ দিতে গেছি দয়ামায়ার বনিয়াদ গড়বার জন্য
আমরা নিজেরা দয়ামায়া রাখতে পারিনি।
তবুও, তোমরা, যেদিন শেষটায় সহজ হবে
মানুষের পক্ষে সব মানুষকে হাত এগিয়ে দেওয়া,
সেদিন তোমরা আমাদের বিচার কোরো না
খুব একটা কর্কশতায়।

অনুবাদ ঃ বিষ্ণু দে

বাগানে জলসিঞ্চন বিষয়ে

আহা! বাগানে জলসিঞ্চন, সবুজকে উৎসাহিত করা।
তৃষ্ণার্ত গাছ-কে জল দান! দাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাও
আর ঝোপ-ঝাড়দেরও ভুলো না,
এমন কি যাদের ফল ধরেনা কিংবা যারা
অবসন্ন, ক্ষীয়মাণ। আর দেখো যেন বাদ না পড়ে
ফুলের মধ্যে মধ্যে আগাছাগুলো—ওরাও
তৃষ্ণার্ত। সিঞ্চিত কোরো না
কেবল মাত্র ঘাসজমির তাজা অংশে অথবা শুধুমাত্র দগ্ধ দিকটায় ;
নাঙ্গা মাটিও চায় সযত্নে চাঙ্গা হতে।

অনুবাদ ঃ বিষ্ণু দে

চাকা পালটানো

পথের ধারের পাড়ে বসে আছি।
ড্রাইভার একটা চাকা পালটাচ্ছে।
যেখান থেকে আমি আসছি, সেটা আমার পছন্দ ছিল না।
যে জায়গায় যাচ্ছি, তাও আমার পছন্দ নয়।
লোকটি চাকাটা পালটাচ্ছে,
তার দিকে কেন আমি তাকিয়ে আছি
অধীর আগ্রহে ?

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

ছাত্র বিনা শিক্ষাদান বিষয়ে

ছাত্র বিনা শিক্ষা দেওয়া
নামডাক বিনা লিখে যাওয়া
সে বড়ো কঠিন কাজ।

বেশ হয় যদি সকালে বেরিয়ে পড়া যায়
তোমার নতুন লেখা পাতা কটি নিয়ে
অপেক্ষমান মুদ্রাকরের কাছে, পার হয়ে গুঞ্জরিত বাজার
যেখানে বিক্রি করে মাছমাংস আর মজুরদের যন্ত্রপাতি :
তোমার বিক্রির জিনিস হলে বাক্য।

চালকটি জোরসে হাঁকিয়ে গেছে,
সকালে তার আর খাওয়া হয়নি
প্রত্যেকটি বাঁকে ছিল বিপদের আশঙ্কা
ত্বরিতে ফটক পার হয়ে
ও যাকে তুলে নিতে এসেছিল
সে আগেই বেরিয়ে পড়েছে।

ঐ তো লোকটি কথা ব'লে যাচ্ছে যার কথা কেউ শোনে না :
ও বড়ো চড়া গলায় কথা বলে
আর পুনরাবৃত্তি করে একই কথার।
ও যা বলে তা ভুল :
কিন্তু কেউ ওকে শুধরেও দেয় না॥

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

প্রেমিকেরা

দেখ বন্য বলাকার ঝাঁক ঐ উধাও বিরাট বৃত্তে।
মেঘমালা পিছে তারা ফেলে যায়, পেলব কোমল
সেই মেঘেরাই ভেসে ভেসে চলে তাদেরই পাখার ছন্দে
যখন উড্ডীন তারা পুরানো জীবন ফেলে অন্য এক খোঁজে।
ওরা দুই দল উড়ে চলে একই ঊর্ধ্বতায় আর একই বেগে,
মনে হয়, যেন কোনো উভয়ত প্রাসঙ্গিকতায়॥
থাকে থাকে মেঘ আর বন্য পাখি এভাবে যে ওড়ে
মধুরায় আকাশের মিলিত সম্ভোগে, ক্রমান্বয়ে ক্ষিপ্র অতিক্রমে!
কোনো দলে থমকায় না কেউ কোনোখানে কোনো ফাঁকে,
কোনো দিকে তাকায় না ফিরে, শুধু পরস্পরে দেখে পরস্পর
আন্দোলিত কীভাবে বাতাসে, প্রত্যেকেই বোঝে অনুভবে
বাতাসও তাদের গায়ে গায়ে চলে, যেমন তারাও সান্নিধ্যে উড্ডীন।
সুতরাং যতই না বাতাস তাদের শূন্যে ঠেলা দেয়,
তারা যদি কেউই না বদলায় কিংবা ছত্রভঙ্গ হয় নাকো,
ততক্ষণ তাদের অংগ যে স্পর্শ করবে এত শক্তি কারো নেই,
ততক্ষণ তারা শুধু বিতাড়িত দুনিয়ার সব ঠাঁই থেকে
যেখানেই ঝড় কিংবা গোলাগুলি তোলে প্রতিধ্বনি।
তাইতো সূর্যের আর চাঁদের অভিন্নপ্রায়, প্রায় একাকার
মুখের তলায় তারা উড়ে চলে পরস্পর মিলে পরস্পরে।
যায় কোথা ?—কোথাও না। কার থেকে, কী থেকে পালায় ?
—তোমাদের সকলের।

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

প্যারির বিপ্লবী শ্রমিকের ঘোষণা

"হে বন্দীরা, কারা আসছে তোমাদের
মুক্ত করতে ?
যারা আসছে তারা তোমাদের
দাসত্বে শরিক
যন্ত্রণায় অংশীদার।
তারা দেখতে পাবে তোমরা ঘর্মাক্ত
তোমাদের ওপর জগদ্দল চাপ।
এমন দৃষ্টি যাদের তবু তারাই
তোমাদের দেখতে অভিলাষী।
শুধু তারাই করবে তোমাদের মুক্ত।
হয় আমরা সকলে
নয়তো কেউ নয়,
হয় কিছুই পাবো না,
নয়তো সবকিছু পাবো।
বেয়নেটই হোক অথবা ডাণ্ডাবেড়ি হোক
আমরা মানব না কিছুই।
হয় আমারা সকলে, নয়তো কেউ নয়।
কোন কিছুই নয় অথবা সব কিছুই।
হে নিপীড়িতের দল,
তোমাদের জন্যে কারা বদলা নেবে ?
বদলা নেবে তারা
যাদের অত্যাচারীরা রেখেছিল দাবিয়ে।
অভ্যুত্থানের সারিতে এসে দাঁড়াও তোমরা
যোগ দাও তোমাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গী ভাইদের সঙ্গে।
আমরা সবাই মিলে বদলা নেবো।
আমরা সবাই, অথবা কেউ নয়।
কোন কিছুই নয়, অথবা সব কিছুই।
কারুর একার সাধ্য নেই অবস্থাকে ফেরাবে।
বেয়নেটই হোক অথবা ডাণ্ডাবেড়ি হোক মেনো না

হে বুভুক্ষুরা, তোমরা তারা
যারা সাহস করলেই সব কিছু ঘটাবে।
যে মানুষটি আর বইতে পারছে না তার বোঝাকে,
সে যোগ দিক তাদের সঙ্গে
যারা ভাইদের কাঁধে কাঁধ দেয়।
আজই একথাটা ঠিক করে নিতে হবে,
যন্ত্রণা আর দুঃখের শেষ করতে হবে আজই,
আগামীকাল নয়।"

অনুবাদ : রণেশ দাশগুপ্ত

জেনির গান

মহাশয়গণ, মা একবার মুখের উপরে
শাপান্ত করেন আমায়,
বলেন, তোর পরিণতি সেই লাশকাটা ঘরে
কিংবা আরও কুৎসিত কোন জায়গায়।
মুখের কথা সহজ বলে,
ওতে কান দিই নি আমি
কথায় কাত হবার পাত্রী আমি নই,
সময় আসুক, দেখবে কী হই আমি,
মানুষ তো আর পশু নয়।
শয্যা পাতো যেমন, শুতে হয় তেমন,
এ তো হক্ কথা,
কিন্তু পা ফেলতে হয়, ফেলব আমি,
মাড়িয়ে দিয়ে যাবে, সে তো তোমাদের।

মহাশয়গণ, বন্ধু একটি ছিল একদা,
বলতো সে সর্বদা
'পীরিতির বড়ো কিছু নেই পৃথিবীতে,'
আর 'শুধু অদ্যকার কথা ভাবা যাক।'

ওহো সখা, কথাটা বলা সহজ বটে,
কিন্তু যৌবন বয়ে যায়
তখন বিছানাই জীবনের সবটা নয়।
হাতে সময় কম, কাজে লাগানো চাই সময়কে,
মানুষ তো আর পশু নয়!
শয্যা পাতো যেমন, শুতে হয় তেমন,
এ তো হক্ কথা,
কিন্তু পা ফেলতে হয় ফেলব আমি,
মাড়িয়ে দিয়ে যাবে, সে তো তোমাদের।

অনুবাদ : সমর সেন

মজুরের চোখে ইতিহাসের কেতাব

কারা গড়েছিল থিবিস নগরীর সাত সাতটি প্রবেশদ্বার?
ইতিহাসের কেতাবে লেখা হরেক রাজার নাম!
কিন্তু বড় বড় চাঙড়গুলো ঠেলে ঠেলে তুলেছিল যারা
তারা কি রাজা ছিল?

ধ্বংস হলো ব্যাবিলন,
কিন্তু প্রতিবার নূতন করে তাকে গড়ে তুললো যারা তারা কারা?
স্বর্ণ-ঝলকিত লিমা নগরকে গড়েছিল যারা
নগরীর কোন্ গ্রহ-গৃহটিতে ছিল তাদের বাসস্থান।
যে সন্ধ্যায় শেষ হলো চীনা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ
সে সন্ধ্যায় কোন আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছিল ক্লান্ত রাজমিস্ত্রীর দল?
সাম্রাজ্যিক রোম বিজয় তোরণে-তোরণে ভর্তি
কিন্তু সেগুলি গড়েছিল কারা?
কাদের বিজিত করেছিলেন সম্রাটেরা?

গানে-গানে অমর হয়ে আছে বাইজান্টিয়াম,
কিন্তু তার সব গৃহগুলিই কি ছিল রাজপ্রাসাদ?

যে রাত্রে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে হঠাৎ প্লাবিত হলো
পুরাণ-কথিত আতলান্তিস নগরী,
সে রাত্রে, সেই দিশেহারা প্লাবনের মুখে দাঁড়িয়েও,
ডুবন্ত মানুষগুলো মালিকের মেজাজ নিয়ে ডেকেছিল
তাদের ক্রীতদাসদের।

তরুণ আলেকজান্দার জয় করেছিলেন ভারতবর্ষ।
জয় করেছিলেন কি তিনি একা ?
সীজার মেরে তাড়িয়েছিলেন গলদের।
কিন্তু একটি বাবুর্চি'ও কি ছিল না তাঁর ফৌজে ?

স্পেনের নৌবহর ধ্বংস হয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেল
কেঁদে ভাসিয়েছিলেন স্পেনের রাজা ফিলিপ,
কিন্তু আর কেউ কি কাঁদে নি ?

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন মহামতি ফ্রেডরিক।
আর কারা জয়ী হয়েছিল তার সঙ্গে ?

ইতিহাসের পাতায় বিজয়-কাহিনী,
কিন্তু বিজয়োৎসবের খরচ জুগিয়েছে কারা ?
প্রতি দশ বৎসর অন্তর একজন করে মহাপুরুষের আবির্ভাব,
কিন্তু কাদের গাঁটের শেষ কানাকড়ি টেনে নিয়ে
তৈরি হয়েছিল এই মহা আবির্ভাব পথ ?
মনে আসে এই ধরনের খুঁটিনাটি কথা,
এই ধরনের হাজারো রকমের প্রশ্ন।

অনুবাদ : সরোজ দত্ত

বইগুলি আমার পুড়িয়ে ফেলুন

সরকারের আদেশ ঃ প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেল সব বই
যা বিপজ্জনক বুদ্ধি যোগায় মগজে ;
বলদগুলোকে সর্বত্র পিঠ চাপড়ে জুড়ে দেওয়া হলো
বই বোঝাই গাড়িগুলোকে বই পোড়ানোর বহ্ন্যুৎসবে
টেনে নিয়ে যাবার কাজে।

সেরা কবিদের নির্বাসিত একজন,
পোড়া বইয়ের তালিকাটি
খুঁটিয়ে দেখলেন। আবিষ্কার করলেন
তাঁরই বইগুলো বাদ গেছে ভুলে ;
ক্ষিপ্ত তিনি, ছুটে গেলেন তাঁর লেখার টেবিলে।
পত্রাঘাতে জানালেন শাসক-শক্তিকে
এ ধরনের দুর্ব্যবহার দয়া করে করবেন না
আমার সাথে, ত্যাগ করবেন না আমাকে।
আমি কি আমার বইয়ের মাঝে সর্বদা সজোরে করি নি
সত্যের ঘোষণা ?

এমন ব্যবহার করছেন আপনারা
যেন আমি ছিলাম মিথ্যাবাদী একজন ঃ
দাবী আমার—
বইগুলি আমার পুড়িয়ে ফেলুন।

অনুবাদ ঃ বিশ্বনাথ বসু

ভারী কামানের গান

জন্ ছিল এক সৈনিক, আর জেম্স্ও তো ছিল তাই।
জর্জ হয়েছিল সার্জেণ্ট দিন কতো।
সৈন্যদলের কিন্তু এসব নামধামে কাজ নাই।
যেতে হল দূরে যুদ্ধসীমায় কুচ্ করে অবিরত।
সৈনিকদের জীবনধারণ
ভারী কামানের খুশির কারণ ;

দক্ষিণে দূরে কুমারিকা থেকে উত্তরে কুচবিহার
কোনো রাতে হলে বৃষ্টি
কারো যদি কাড়ে দৃষ্টি—
ভীত বা হিংস্র চেহারা
ভীনদেশী কোনো বেচারা,
তারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো কোর্মা পাকাবে তার।

জন্ শীতে কাবু হলো এক রাতে,
জেম্স পেল মদে খাসা আরাম।
হেঁকে বলে জর্জ—ওহি ঠিক বাত,
তবু সেপাইকে খানা হারাম।
সৈনিকদের জীবনধারণ
ভারী কামানের খুশির কারণ ;
দক্ষিণে দূরে কুমারিকা থেকে উত্তরে কুচবিহার
কোনো রাতে হলে বৃষ্টি
কারো যদি কাড়ে দৃষ্টি—
ভীত বা হিংস্র চেহারা,
ভিনদেশী কোনো বেচারা,
তারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো কোর্মা পাকাবে তার।

জন্ চলে গেছে পশ্চিমে, জেম্স মরে গেছে কতোকাল।
জর্জ বেপাত্তা কোথায় মাথার দোষে।
তো সে যাই হোক, রক্ত এখন রক্তেরই মতো লাল।
নতুন নতুন সৈন্য আবার ভর্তি করছে কষে।
সৈনিকদের জীবনধারণ
ভারী কামানের খুশির কারণ ;
দক্ষিণে দূরে কুমারিকা থেকে উত্তরে কুচবিহার
কোনো রাতে হলে বৃষ্টি
কারো যদি কাড়ে দৃষ্টি—
ভীত বা হিংস্র চেহারা,
ভিনদেশী কোন বেচারা,
তারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো কোর্মা পাকাবে তার।

অনুবাদ : মণীন্দ্র রায়

ডায়লেকটিক প্রশস্তি

খুঁজেও পাবে না এমন শব্দ একটিকে
দুজনে যেটা মিলিয়ে দেবার জন্যে তৈরি।
বৃষ্টি যেমন ঝরছে নিয়ত মাটির দিকে
তুমিও নিয়ত তেমনি আমার শ্রেণীর বৈরী।

প্রকৃত প্রগতি
এগিয়ে যাবার শেষ নয় সব।
সে জেনো কেবলি অগ্রগতি।
প্রকৃত প্রগতি
অগ্রগতিকে করে সম্ভব,
অথবা সবলে কায়েম করে সে মুক্তমতি।

যেদিন পৃথিবী ছেড়ে যাবে, এটা দেখো
এই যেন শুধু না হয়—তুমিই ভালো ছিলে;
এও দেখো, যেন যে-জগৎ তুমি ছেড়ে গেলে
সেও যোগ দেয় ভালোর মিছিলে।

স্বপ্ন, সোনালি-ভবিষ্যতের প্রত্যাশা
কল্পনা চোখে দেখে শস্যের ঢেউ শত শত।
চাষী হে, তোমার আগামী দিনের বীজ ক্ষেতকেই
এখনি, আজকে, ভাবতে চাইছ নিজের মতো!

অনুবাদ : মণীন্দ্র রায়

ব্রেষ্‌ট-এর একটি কবিতা৩

১

আমুরের তীরে নিকোলায়েভ শহর
উনিশ-শো ত্রিশ সালে সেই শহরের
বাসিন্দা একজন মস্কোয় এলে
বন্ধুরা শুধিয়েছে তাকে—
'তোমার ওদিককার কি সব খবর বলো দিকি ?'
'কি আর জানাব বলো ?' বললো সে, 'ছয় হপ্তা
কেটে গেছে রওনা দেবার দিন থেকে,
এবং ছয় হপ্তায় সব কিছু বদলে যায়
আমার ওখানে।'

২

ভিতের গায়ে খড়ির লিখন : যুদ্ধ ! যুদ্ধ চাই !
যে লিখেছে, সে কিন্তু ইতিমধ্যে খতম।

৩

কামান ও শিরস্ত্রাণ সবই বৃথা হলো,
লেনিনগ্রাদে পৌঁছাল না শ্বেতসৈন্য দল।
কামান ও শিরস্ত্রাণ, শ্বেতসৈন্য দল
কোনো দিনই পারেনি, পারবে না,
চেপে ধরতে ইতিহাসের চলমান চাকা।

অনুবাদ : রবীন্দ্র মজুমদার

বদমাশের মুখোশ

একটি জাপানী মূর্তি ঝুলছে দেয়ালে আমার
বদমাশ এক দানোর মুখোশ, সোনা বার্নিশে সজ্জিত
দেখলাম ওকে সহানুভূতিতে
কপালের শিরাগুলি ফোলা—
বোঝা যায়
কত কষ্ট হয় বদমাশ হতে।

অনুবাদ : শৈলেন বসু

দোলনার গান

যখন তোকে ধরেছিলাম পেটে
গোছ গোছানো ছিল না মোটে কিছুই
বলেছি কত মাঝে মাঝেই, বইছি যারে আমি
আসছে সে এক নোংরা দুনিয়ায়।

তাইতো আমি দিলাম তুলে দেখাশোনার ভার
সে যাতে আর ভুল করে না পরে
বইছি যাকে নিজের পেটে, দেখতে হবে তাকে
সোনা আমার, থাকতে যেন পারিস দুধে-ভাতে।

দেখছি আমি, দেখছি ওদের কয়লাখনির মুখ
একটি বেড়ায় চারপাশটা ঘেরা
বলেছিলাম, পেটে যে আছে, সেই তো নেবে ভার
কয়লাগুলোর যা দিয়ে সে পাবে গরম, তাপ।

দেখেছি কত রুটির বাহার জানলাগুলোর ধারে
যা দিয়ে হয় পেটের খিদে দূর
ভেবেছি, পেটের ছেলেটাই তো নেবে রুটির ভার
যা দিয়ে তার বাড়বে দেহখান।

যুদ্ধ বাধলে দাঁড়াবে সে বাপের পাশাপাশি
লড়াই থেকে আসবে না'ক ফিরে
বলেছিলাম, পেটের ছেলে চলবে দেখে শুনে
এখন বিপদ ঘটে না যেন নিজের।

যখন তোকে ধরেছিলাম পেটে
আপন মনে নিচু গলায় বলেছিলাম কত
সোনা আমার, বইছি তোকে পেটে
তোর যেন হার হয় না কোনো মতে।

অনুবাদ ঃ কৃষ্ণ ধর

যুদ্ধের প্রথমিক পাঠ থেকে

উন্মত্ত সামরিক পরিবেশে, আন্দোলিত পতাকার ঝড়
জার্মান স্বস্তিকার ধর্মযুদ্ধ !
অথচ শেষ পর্যন্ত করণীয় একটাই ; একটা আশ্রয় সন্ধান;
আর তা তুমি পাবে না।

মস্কোতে এসে তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে
অন্ধ, তখন তুমি বুঝবে
তোমার ভ্রান্ত নেতা এ শহরের দখল পাবে না,
আর দখল করলেও তুমি তা দেখবে না।

আমাদের সন্তানদের দিকে তাকাও-স্তব্ধ, রক্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত,
বরফ জমা ট্যাঙ্ক থেকে ঝুলছে—
করালদ্রংষ্টা নেকড়েরও আশ্রয় প্রয়োজন।
ওরা জমে গেছে, উত্তাপ দাও ওদের।

ভাইরা আমার ! এই সুদূর ককেশাসে
আমি, সোয়াবিয়ার কৃষক, কবরে ঘুমিয়ে আছি,
আমাকে গুলি করেছে এক রুশ কৃষক—
দীর্ঘকাল আগেই আমি সোয়াবিয়ায় পরাজিত।

চেরবার্গের কাছে সেই জুনের সকালে
সমুদ্র থেকে উঠে এল খনি এলাকার মানুষ,
সংবাদে প্রকাশ, সে এসেছিল রুর-এর লোকের বিরুদ্ধে
আসলে, সে এসেছিল স্তালিনগ্রাদের লোকের বিরুদ্ধে।

শিশুসন্তান তোমার কোলে, রাইফেল ঝুলছে পাশে
এই রক্তাক্ত সংগ্রামের পরে তুমি আনতে চাও
আনন্দিত জীবন, আমি কামনা করি—
আমাদের মানুষের সন্তান-সন্ততি
তোমাকে ঘিরে থাকুক।

দীপ্ত লাল শহর মস্কোতে যখন এলাম,
কৃষিখামার আর কারখানার লোকেদের মুখোমুখি
হলাম আমরা
জার্মান নামে অভিহিত জাতিটি ধরেই
সমস্ত জাতির নামেই মার খেলাম।

মনে হচ্ছে, আমিই তোমাদের ঘরবাড়ি ভেঙেছি,
কারণ সেও আমার ভাইরাই করেছে,
আমার লজ্জার কথা
যখন শুনলাম তোমরা তাদের মার দিয়েছ, হটিয়ে দিয়েছ
আমার ভীষণ আনন্দ হলো।

অনুবাদঃ সতীন্দ্র মৈত্র

চাষীর চিন্তা

চাষীর চিন্তা
শুধুমাত্র তার খেতকে ঘিরে,
গরু-বাছুরের তদারকি,
ট্যাকসো মেটানো।
সন্তান উৎপাদন,
বিনা মুনিষে কাজ চালানো
আর দুধ বেচে
সংসার প্রতিপালন।

শহুরে বাবুদের মতে—
চাষীদের নাকি জমিঅন্ত প্রাণ
তরতাজা তাদের স্বাস্থ্য
আর তারাই নাকি
জাতির স্তম্ভ।

আলবৎ
এ সবই তারা বলেন,
জমিঅন্ত প্রাণ চাষীদের
সতেজ স্বাস্থ্য তাদের
আর তারা
জাতির মেরুদণ্ড।

অথচ
চাষীর ভাবনায় আছে
শুধু তার জমিটুকু,
গরুবাছুরের খবরদারি,
ট্যাকসো গোনা,
সন্তান জন্মানো,
কি করে বাঁচবে মুনিষের খরচ,
কি করে চলবে সংসার
দুধ বিক্রির পয়সায়।

অনুবাদ : বেলা দত্তগুপ্ত

পশ্চিমের উদ্দেশে

পশ্চিমের যারা বলেন,
প্রকৃত বন্ধু চিনে নিতে পারেন নি ব্রেখ্‌ট
তাদের তিনি জবাব দেন :

"ধীরে বন্ধু, ধীরে—
বিশ্বাসঘাতকের চুম্বন প্রথমে নামে শিল্পীর উপর
তারপর ভাঙ্গে শ্রমিকের পাঁজর।
পেট্রলের বোতল হাতে
গুপ্তপথে মুচকি হেসে
দহনকারীর দল উঠে আসে শিল্পের মন্দিরে।
যে-মানুষ সংকীর্ণতম
সেও খুশি মনে মনে শান্তির কামনা করে
মুষ্টি-শিল্পের ভজনাকারীর চেয়ে
সে-মানুষ শিল্পের জন্য বেশি বরণীয়।"

অনুবাদ : ধনঞ্জয় দাশ

৫

যুদ্ধ

যদি যুদ্ধ তোমার
মর্জিমাফিক না হয়
তবে জয়ের পাশেই
গড়াবে তোমার শব
যুদ্ধ তাই ছানা-মাখনের
ব্যবসা নয় ঃ
যুদ্ধ হলো ইস্পাত-সীসার
কারবারী প্রস্তাব।

অনুবাদ ঃ ধনঞ্জয় দাশ

শিক্ষার প্রশস্তি

সহজতম জিনিসগুলি শেখো। যে-তোমার
দিন আগেই এসেছে,
এখনো শেখার সময় যায়নি, কখনো যাবে না,
অ-আ-ই সামান্যই,
তবু তা শেখো। তা যেন তোমায় নিরুৎসাহ না করে,
আরম্ভ কর। তোমাকে জানাতেই হবে সব,
তোমাকে নিতেই হবে নেতৃত্বের ভার।

শেখো, পাগলা গারদের মানুষ
শেখো, কয়েদী মানুষ
শেখো, রান্নাঘরে বাড়ির বউ
শেখো, ষাট বৎসর বয়স্ক।
যে-তুমি গৃহহীন, খুঁজে বার কর তোমার পাঠশালা।
যে-তুমি হি-হি ক'রে কাঁপছ, শান দাও বুদ্ধিতে।
ক্ষুধার্ত মানুষ, হাত বাড়াও বই-এর দিকে ঃ ওটা অস্ত্র।
তোমাকে নিতেই হবে নেতৃত্বের ভার।

প্রশ্ন করতে ভয় পেও না, ভাই।
মেনে নিও না সহজে,
নিজেই দেখতে হবে তোমায়
যা তুমি জানো না
যা তুমি নিজে জানো না।

হিসাব-নিকাশ তোমারই,
দাম যা দেবার, তুমিই দেবে।
প্রতিটি পদার্থে আঙুল ঠেকাও,
প্রশ্ন কর কী ক'রে এটা এল এখানে ?
তোমাকে নিতেই হবে নেতৃত্বের ভার।

অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

'বীরাঙ্গনা মাতা'র গান থেকে

যদি তাকৎ তোমার থাকে কমতি
তবে পারবে না জয়ের মুখ দেখতে ;
যুদ্ধ সে একটা ব্যবসাই
মাখনের বদলে ছুরি-গুলিতে।

এসেছে বসন্ত, খেরোস্তানী জাগো।
বরফ গলছে, মৃতেরা শুয়ে,
আর, যা কিছু এখনো মরণ-ফাঁদে পড়েনি
বিড়বিড় করছে তারাই পেছনের পায়ে লাফিয়ে।

উলম থেকে মেৎজ, মেৎজ থেকে মোরাভিয়া
বীরাঙ্গনা মাতা সব ঘাটেই ঘুরছে,
লড়াইটা জানে তার সাকরেদের কারবার
দেওয়া চাই যোগান গোলাগুলি আর বারুদের
আর, বারুদই নয়, সেই সঙ্গে লোকলস্কর লড়বার।
তাই আজই যাও, নাম লেখাও ফৌজে,
আর আজই যাও, নাম দাও তোফা মৌজে।

দেখেছ জ্ঞানী সোলেমান,
হলো তার কী হাল !
মানুষটার ছিল নজর
বেজায় পরিষ্কার ;
তবু সেই যে অমন জ্ঞানী,
রাত না হতে কাবার
জগতের লোক দেখল
জ্ঞানই হলো তার কাল ।

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে, ভাই,
নেইক' যার এইসব বিবেকের বালাই ।
দেখেছ বীর সীজার,
শেষটা হলো কী হাল !
ছিল ঈশ্বরের মতো পোক্ত
তখ্‌ত-তাউস তার ;
তবু উঠল যখন তুঙ্গে
তখনই পড়ে কাবার,
জগতের লোকে দেখল
দম্ভই তার কাল ।

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে ভাই,
নেইক' যার এইসব তেজের বালাই ।

দেখেছ সাধু সোক্রাতিস
হলো তার কী হাল ।
মানুষটা ছিল সত্যের
আর সততার আধার,
তবু শাসকরা তাকে করল
হেমলক-বিষে কাবার ।
জগতের লোকে দেখল
সত্য হলো তার কাল ।

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে ভাই
নেইক' যার এইসব সততার বালাই।

দেখেছ সে-সব আস্তিক,
দশ-অনুজ্ঞার দাস ;
তাতে কী হলো জগতের
ধর্মাধর্মের নিকেশ ;
আমরা বটে ধার্মিক
তবু রাত না হতেই শেষ,
ঈশ্বরের ত্রাস,
আমাদের নিয়ে এল কোথায় !

সেই মানুষই সুখী, বলতে গেলে ভাই,
নেইক' যার এইসব আস্তিক্যের বালাই।

আহারে, আহা,
খড়ের গাদায় কি খস্‌খস্‌ করে ?
প্রতিবেশীর ছেলেটা ফোঁপায়,
আমারটি তো বেশ
নেচে কুঁদেই বাড়ে।
থাক না,
প্রতিবেশীর কোমরে ত্যানা ;
আমার পরনে তো সিল্কের জোব্বা,
খাস দেবদূতের কাছ থেকেই
আনা।

প্রতিবেশীর সানকিটা শূন্য,
হোক না-আমারটাতে তো পরমান্ন।
যদি তাতে মনে লাগে ভায়া,
কোরো একটু উঁহু আহা-আহা !
খড়ের গাদায় কি খস্‌খস্‌ করে ?

একটা তো জমি নিল পোল্যাণ্ডে,
আর একটা উজবুক কোন রাজ্যে মরে !
সব ভালো সব মন্দের শেষে
যুদ্ধটা ঠিক চলেছেই কায়ক্লেশে,
একশ' বছর চলবে নাকি এ লড়াই ?

মানুষজন যে হলো আকালের বলি,
সেনারা না পায় মাইনে, শূন্য থলি,
কর্তারা সব বামাল করছে চুরি ।
যদিবা আবার কপাল ফেরে আখিরি
যুদ্ধটা আজও চলেছে নেহাৎ-ই, তাই ঃ

এসেছে বসন্ত, খেরোস্তানী জাগো !
বরফ গলছে, মৃতরা শুয়ে,
আর, যা কিছু এখনো মরণ-ফাঁদে পড়েনি,
বিড়বিড় করছে তারাই, পিছনের পায়ে লাফিয়ে ॥

অনুবাদ ঃ সিদ্ধেশ্বর সেন

'ডি মুটার' থেকে

এই তো আমাদের কমরেড ভ্লসোভা, চমৎকার
যোদ্ধা ।
খাটাখাটুনীতে রপ্ত, বুদ্ধিমতী, নির্ভরযোগ্য ।
লড়াইয়ে ভরসা করার মতো । শত্রুর
বিরুদ্ধে কৌশলী , আর
প্রচারে, খুবই দড় । কাজটা
সহজই
তবু লেগে-থেকে তা করা, এবং সেটাই অপরিহার্য ।
যেখানেই লড়ুক না কেন, তিনি তো আর একা নন ।
অন্যেরা তাঁরই মতো লড়াই দিয়ে যাচ্ছে, লেগে-থেকে,
ভরসা-করার মতো
বুদ্ধি খাটিয়ে,
ট্ভের , গ্লাসগো, লিওন আর শিকাগোয়

সাংহাই কি কলকাতায়
সমস্ত দেশের সব ভালোবাসোভরাই
সামান্য হলেও চমৎকার এক-একজন লড়ুয়ে
নাম-না-জানা সৈনিক বিপ্লবের,
যাকে আমাদের না-হলেই-নয় ॥

অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন

আট নং হাতির গান

সাতটি হাতি খাটত মেজর চুঙের কারবারে,
আর আট নং-টি পেছনে চলত বরাবর,
সাতটি ছিল বুনো আর আট নং-টি পোষা
আট রাখত বাদবাকিদের ওপরে কড়া নজর।
ঠিকসে চলো ;
মেজর চুঙের কারবার—জঙ্গল,
দ্যাখো, ঠিক সব সাফ্সুফ্ চাই, আজই রাতের আগে,
হুকুম যে তাই। বুঝেছো ?

সাতটি হাতি সাফ করেছে বনবাদাড়,
আটের পিঠে মালিক মেজর খোদ,
আট দেখছে হুকুম তামিল হচ্ছে কিনা ঠিক,
বাকি সাতের দিকে রাখছে চোখ।
জোরসে লাগাও ;
মেজর চুঙের কারবার—জঙ্গল,
দ্যাখো, ঠিক সব সাফ্সুফ্ চাই, আজই রাতের আগে,
হুকুম যে তাই। বুঝেছো ?

সাতটি হাতি কাজের চাপে হিম্সিম্,
মাটি থেকে সব ঝাঁকড়া দিয়ে উপড়ে ফেলা গাছ।
মেজর কিন্তু নয়কো মোটেই খুশ্
আটেরই ঠিক মনের মতো কাজ—

হ'ল কি হে ?
মেজর চুঙের কারবার—জঙ্গল,
দ্যাখো, ঠিক সব সাফ্‌সুফ্‌ চাই, আজই রাতের আগে,
হুকুম তো তাই। বুঝেছো ?

সাতটি হাতি। দাঁত আর নেই একটিরও,
আট নং-টি দাঁতালো, বেশ গোলগাল।
কিমুনি দেখে বাকি সাত-কে গুঁতিয়ে করল সারা,
মেজর অমনি হেসেকুঁদে ওঠে একগাল—
তাড়িয়ে চলো।
মেজর চুঙের কারবার—জঙ্গল,
দ্যাখো, ঠিক সব সাফ্‌সুফ্‌ চাই, আজই রাতের আগে,
হুকুম যে তাই। বুঝেছো ?

অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন

প্রতিজ্ঞাপত্র

যেহেতু আমাদের দুর্বলতার সুযোগে
তোমরা করেছ আইন আমাদের ক্রীতদাস করে রাখতে
আজ থেকে সে আইন অমান্য একযোগে
যেহেতু চাই না আর তোমাদের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে।
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক আর কামান
সৃষ্টি করেছ চিরকাল সন্ত্রাসের মহাশ্মশান,
সে যুগের অন্তিমকাল আজ ঘনায়মান,
পদানত জীবনের চেয়ে শ্রেয়, সংগ্রামে আত্মদান।
যেহেতু ক্ষুধার দহন-জ্বালায় আমরা হেলেছি মরণে,
কেননা তোমরা লুণ্ঠন করেছ, আর আমরা থেকেছি আশে,
আজ বলে যাই শুধুমাত্র সূক্ষ্ম কাচের আবরণে—
বঞ্চিত করে সঞ্চিত রুটি সাজিয়েছিলে পরিহাসে।
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক……

যেহেতু তোমরা গড়েছ প্রাসাদ, আমাদের ভূমি কেড়ে,
আর লক্ষ মানুষের মাথার ওপরে নেই কোনো আবরণ।
সে যুগের শেষ ঘোষণা করে নিলাম প্রাসাদ কেড়ে,
কেননা বস্তির কালো গহ্বরে আর থাকবে না এই পণ।
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক……

যেহেতু দেশে প্রচুর কয়লা, প্রচুর জ্বালানি তেল,
তথাপি মরেছি আগুন বিনা, বাতি বিনা ঘর কালো,
সে যুগের শেষের সঙ্গে শেষ মজুতদারির খেল,
যেহেতু আমাদের চাই উত্তাপ, জ্বালাবো ঘরের আলো।
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক……

যেহেতু আর চলবে না খেলা, চলবে না মুনাফাবাজি ;
আমাদের দিয়ে চলবে না করা মুনাফা আর এক রত্তি ;
কেড়ে নিলাম যত কারখানা সব মেসিন যন্ত্ররাজি ;
যেহেতু তোমাদের নেই অধিকার, সব জনতার সম্পত্তি।
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক…

যেহেতু তোমাদের সরকার বিলোয় অজস্র আশ্বাসবাণী,
আর যেহেতু করি না বিশ্বাস তার মিথ্যাচার আর দম্ভ,
সে সরকারের শেষ ঘোষণা ক'রে গণনেতৃত্ব মানি,
এখন থেকে গড়বো নূতন জীবন-জয়স্তম্ভ।

ভয় দেখিয়ে লাভ নেই আর আগ্নেয়াস্ত্র নাও হটিয়ে।
তবে কি বোঝো না গুলিবর্ষণ ছাড়া কোন অন্য ভাষা ?
তাই হবে তবে, কড়াক্রান্তিতে পাওনা দেব মিটিয়ে।
ঐ আগ্নেয়াস্ত্র ঘুরিয়ে ধরবো, মিটবে তোমার আশা।

অনুবাদ ঃ উৎপল দত্ত

শেকস্‌পিয়রের হ্যামলেট প্রসঙ্গে

[সনেট]

এই যে দেহটা, স্ফীত প্রাণহীন,
এখনো খুঁজে পাবে চিন্তার জীবাণু।
ইস্পাতে সজ্জিত জগতে অসহায় অক্ষম,
ঢিলে কামিজ পরা এই আত্মগত মাতাল।

দামামা বাজিয়ে আবার জাগাবে ওকে
ফার্টিনব্রাস আর তার নির্বোধের দল
এক টুকরো জমি দখল অভিযানে
মৃত সৈনিকের সমাধির চেয়ে ছোট।

তাই তো ওর মাংসপেশী কম্পিত ক্রোধে,
মনে হয় ও করেছে অনেক কালক্ষেপ,
সময় এসেছে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটাবার।

সুতরাং শেষ অঙ্কের শেষে আমরা গদগদ,
ওরা বলে, হ্যাঁ, এ রাজার মতন রাজা হতো,
যদি বসতে পেত সিংহাসনে।

অনুবাদ : উৎপল দত্ত

ক্রিকোর গান

এবং মানুষ, যেহেতু মানুষ ভাই,
খেতে চায় সেও সামান্য একমুঠো
ফাঁকা বুলি শুনে সে খুশি হয়না আর
বুলিতে তো ভাত জোটে না, ও-বুলি ঝুটো।
বাঁয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই···তিন,
বাঁয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই···তিন

যেখানেই তুমি থাকো নাকো কমরেড
শ্রমিক, যুক্তমোর্চায় আসা চাই
কেননা তুমি যে নিজেও শ্রমিক ভাই।

এবং মানুষ, যেহেতু মানুষ, তাই
জুতো পেটা হতে চায়না সে একবারো
চায়না সে হতে কারো ক্রীতদাস আর
প্রভু হতেও সে চায়না উপরে কারো।
বাঁয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই···তিন,
বাঁয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই···তিন

যেখানেই তুমি থাকো নাকো কমরেড
শ্রমিক, যুক্তমোর্চায় আসা চাই
কেননা তুমি যে নিজেও শ্রমিক ভাই।

সে এক মানুষ, মানুষ সর্বহারা
অন্যে তো তাকে মুক্তি দেবেনা আজ—
শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আনতে পারা
কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীরই কাজ।
বাঁয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই···তিন
বাঁয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই···তিন

যেখানেই তুমি থাকো নাকো কমরেড
শ্রমিক যুক্তমোর্চায় আসা চাই—
কেননা তুমি যে নিজেও শ্রমিক ভাই।

অনুবাদ : **শান্তিশেখর সিংহ**

সংহতির গান

ওঠো জাগো, এই পৃথিবীর জনগণ
জোট বাঁধো, রেখো একথা মনের মাঝে,
এখন থেকে তো এ পৃথিবী তোমাদেরই
মহান ধাত্রী তোমাদের হয়ে আছে।

এগোও, ভুলোনা একথা একটি বারও
শক্তি রয়েছে আমাদের সে কোথায়
ক্ষুধায় কিংবা খাবার সময় হলেও
ভুলোনা ঐক্য, ভুলোনা এগোনো যায়।

কালো সাদা আর বাদাম হলদে রং
বরবাদ করো তোমাদের হানাহানি
নিজেদের মাঝে কথা সারা করো আগে
দ্রুত গড়ে তোলো সবার ঐক্যখানি।

এগোও, ভুলোনা একথা একটি বারও
শক্তি রয়েছে আমাদের সে কোথায়
ক্ষুধায় কিংবা খাবার সময় হলেও
ভুলোনা ঐক্য, ভুলোনা এগোনো যায়।

অনুবাদ : শান্তিশেখর সিংহ

লেনিন বন্দনায় কুবানবুলাকের সতরঞ্চি তাঁতী

প্রায়শ বন্দনাধন্য এবং বিশ্রুত
কমরেড লেনিন! প্রতিমূর্তি রাশি বিরাজিত আর প্রতিচ্ছবি
নামাঙ্কিত তাঁর নামে অনেক নগর এবং শিশুরা,
অসংখ্য কথিকা প্রচারিত বিভিন্ন ভাষায়,
বহু-সমাবেশ এবং মিছিল,
সাংহাই থেকে শিকাগো—লেনিনের বন্দনায়।
অতএব কুবানবুলাকের সতরঞ্চি তাঁতী সবে মিলে
বন্দনা তার করেছিল, তুর্কিস্থানে ক্ষুদ্র এক দক্ষিণ অঞ্চলে।
সেখানে সন্ধ্যায় উঠে এল, জনাকুড়ি সতরঞ্চি তাঁতী
জ্বরিতকম্প্র, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মাকুগুলো রেখে।
জ্বরব্যাধি ঘেরা চারিধার : রেলওয়ে স্টেশন
মশকবাহিনী যেন ঘনমেঘে পুষ্ট,

যাহা উপ্ত জলাভূমে
পুরাতন উটের সমাধিপটভূমে।

কিন্তু রেলগাড়ী,
যে প্রতি পক্ষে আনে একবার ধোয়া আর জল, অবশেষে আনে
একদিন সংবাদ নবীন
সমাগত কমরেড লেনিনের বন্দনার দিন।

এবং সিন্ধান্ত নিল কুবানবুলাকের লোক
দরিদ্র মানুষ, সতরঞ্চি তাঁতী
কমরেড লেনিনকেও তাদেরই গ্রামে
প্রতিষ্ঠিত করা হবে জিপ্সাম মূর্তিতে।

যখন মূর্তির জন্য সংগৃহীত হলো অর্থ, তারা তৎক্ষণাৎ
দাঁড়ায় জ্বরিতকম্প্র এবং গণনা করে
বহুকষ্টে সংগৃহীত তাহাদের ধন, কম্পিত দু'হাতে।
আর লালফৌজের স্টেপা গামালেভ,
যে ছিল সতর্ক খুব হিসাবে ও সঠিক দৃষ্টিতে,
প্রস্তুতি সে লক্ষ্য করে লেনিন-বন্দনার
আর প্রীত হয় ; কিন্তু সে লক্ষ্য করে তাদেরও অস্থির হাত।
এবং সে অকস্মাৎ করে এ-ঘোষণা,
মূর্তির অর্থে পেট্রোলিয়াম হবে কেনা, আর
তাতে নিষিক্ত হবে জলাভূমি, উটের সমাধিপটভূমে ;
মশা সব আসে যেথা হতে,
যাতে জ্বর ব্যাধি ধ্বংস হবে।

এই পথে জ্বর-ব্যাধি ধ্বংস হলো
কুবানবুলাকে মৃতেরও বন্দনা হলো
কিন্তু ভুলে গিয়ে নয় কমরেড লেনিনের নাম।

এ সিন্ধান্ত তারা নিয়েছিল ঃ বন্দনার দিন বহেছিল
তাদের পুরানো পাত্রভরা কালো পেট্রোলিয়াম,
একজনের পর আরেকজন ;
আর হয়েছিল গোষ্পদের তা দিয়ে সিঞ্চন।

এইভাবে উপযোগী হয়েছিল তারা লেনিনের বন্দনায় ;
আর সে বন্দনা তাঁর, উপযোগী হয়েছিল তাদেরও নিজের
এবং এভাবেই তারা তাঁকে উপলব্ধি করেছিল হৃদয়ে তাদের।

আমরা শুনেছি, কিভাবে কুবানবুলাকের লোক
করেছিল লেনিন-বন্দনা
ঐ সন্ধ্যাকালে, ক্রীত সব পেট্রোলিয়াম গোষ্পদে উজাড় ক'রে।
ঐ জমায়েত থেকে উঠেছিল একটি মানুষ
তার এই দাবি যে,
স্টেশনে ফলক এক তোলা হোক
এবং এই ঘটনার ইতিবৃত্ত এইভাবে লেখা হোক তাতে :
জ্বরনাশা পেট্রোলিয়ামের একটন দিয়ে,
প্রতিষ্ঠাপিত হলো প্রিয় মূর্তি লেনিনের।
এ সব কিছুই ছিল লেনিনের বন্দনায়,
আর, এ সব কিছুই তারা করেছিল,
করেছিল তারা সেই ফলকটিরও প্রতিষ্ঠা।

অনুবাদ : শান্তিশেখর সিংহ

পাভেলের গান

['ডি মুটার' থেকে]

ওদের হাতে আইন, নিয়মকানুন
ওদের হাতেই প্রায়শ্চিত্ত, জেল ;
না-ই বললাম পি-ডি-অ্যাক্টের কথা !
দারোগা-সাহেব জজ-সাহেবও হাতে
পয়সাকড়ি কামায়, হুকুম ধরে ধামায়
বেশ তো, কী-ই বা তাতে ?

ধ্বংস হয়ে যাবার আগে (খুব দেরি নেই তার)
দেখবে ওরা কীর্তি ওদের সমস্ত চুরমার।

ওদের হাতে কাগজ, ছাপাখানা
ওদের হাতেই, কণ্ঠরোধ, মার ;
না-ই বা বললাম রাজা-উজীরের কথা !
পাণ্ডা-পুরুত-মাস্টারেরাও হাতে
পয়সাকড়ি কামায়, হুকুম ধরে ধামায়
বেশ তো, কী-ই বা তাতে ?

ধ্বংস হয়ে যাবার আগে (খুব দেরি নেই তার)
দেখবে ওরা কীর্তি ওদের সমস্ত চুরমার।

ওদের হাতেই গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক
মেশিনগান অথবা হাত-বোমা ;
না-ই বা বললাম লাঠি গদার কথা !
সৈন্যপুলিশ সবই ওদের হাতে
পয়সাকড়ি পায় না তবু হুকুম ধরে ধামায়
বেশ তো, কী-ই বা তাতে ?
শত্রু ওদের এতই শক্তিমান ?
বলছে ওরা 'এক-পা দু-পা এল রে ঐ, এবার
থামা ওদের থামা।'
দিন আসছে, খুব দেরি নেই তার
দেখবে ওরা কোন কিছুই লাগছে না আর কাজে
বুক ভেঙ্গে স্বর বেরিয়ে আসবে 'থামো', কিন্তু ওদের
গোলাবারুদ সোনাদানাও বাঁচাতে পারবে না।

অনুবাদ ঃ শঙ্খ ঘোষ

এখনই

['ডি মুটার' থেকে]

যদি বেঁচে থাকো, কখনো বোলো না : না !
নিশ্চিত নয় যাকে নিশ্চিত ভাবো।
ঠিক একইভাবে থাকবে না কিছু আর
প্রভুদের কথা বলা তো হয়েছে, আজ
প্রজাপুঞ্জের গলা তুলবার দিন।
কার এ সাহস, কে বলে 'কখনো না' ?
কার দোষে এই নিপীড়ন ? সে তো আমাদেরই।
কার জোরে সব শাসন ধ্বংস ? আমাদেরই।
মার-খাওয়া দল দাঁড়াবে সটান গায়ে
পরাভুত ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে ফিরে।
যে-মানুষ তার দশ দিক জানে, কে পারে ঠেকাতে তাকে
আজ নিপীড়িত, কাল সেই হবে জয়ী
'কখনো-না' থেকে ক'রে দাও তাকে 'এখনই'।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

মায়ের কাছে বিপ্লবীদের গান

['ডি মুটার' থেকে]

গুলিতে মরেছে, ভালোবোসা, তোমার ছেলে।
দেয়ালে ঠেকিয়ে
ওরই মতো সব মানুষের হাতে গড়া
দেয়ালে ঠেকিয়ে গুলিতে মেরেছে ওকে
ওরই মতো সব মানুষের গড়া বুলেট বা বন্দুক
উঠেছিল ওর বুকে

ওরা ফিরে গেছে অন্য কোথাও
পালিয়ে গিয়েছে অন্য কোথাও, তবু ওর স্থির চোখে
বেঁচে ছিল ওরা নিজস্ব কীর্তিতে।
এমন কি যারা গুলি ছুঁড়েছিল তারাও
ওর চেয়ে খুব ভিন্ন তো নয়
অসম্ভব না ওদেরও শেখানো !

বন্ধুরেই হাতে বানানো শিকলে, বন্ধুরেই হাতে পরানো শিকলে
যেতে যেতে তবু চোখে প'ড়ে যায় ওর—
কতো ঘন হয়ে বেড়ে ওঠে কারখানা
চুল্লিতে চুল্লিতে !
তাছাড়া তখন ভোরে
টেনে বার ক'রে নেবার যোগ্য সময়—
তখনো শূন্য কারখানা তবু ভরা লাগে ওর চোখে
যেন শত লোক জোগায় মদৎ
বাড়ে আরো বাড়ে লোক।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

শিশুদের জন্য গান, ১৫৯২

বিশপ, আমি উড়তে পারি, শুধু
লক্ষ্য করুন কি কৌশলে করি,
এই না বলে খলিফা এক যাজকের উদ্দেশে
ডানার মতো কি সব জিনিস নিয়ে
উঠল সোজা গির্জাবাড়ীর চওড়াপানা ছাদে।
যাজক গেলেন চলে :
খলিফার ঐ কথায়
তিনি বলেন, আজগুবি সব কথা--
মানুষ তো নয় পাখি,
কক্ষণো না, উড়বেই না কেউ কস্মিন কালে।

গেলরে গেল খলিফা জাহান্নামে,
বলে সবাই যাজকের উদ্দেশে।
কথাটি ওড়ে মেলার মুখে মুখে !
নকল পাখা পলকে ধ্বসে যায়
খলিফা পড়ে—তীরগতিতে পড়ে
বড়ো কঠিন পাথুরে চত্বরে।

বাজাও; ঘণ্টা বাজাও গির্জাচূড়ায়
ধীর-মন্থর লয়ে;
আজগুবি সব কথা—
মানুষ তো নয় পাখি,
কক্ষণো না, উড়বেই না কেউ কস্মিন কালে,
ধর্মযাজক প্রাকৃতজনকে বলে।

অনুবাদ : বিতোষ আচার্য

ব্রেখ্ট-এর একটি কবিতা

যাঁরা প্রতিদিন টেবিলে সাজানো মুরগীর ঠ্যাং মুখে পুরে দ্যান,
অভাজনদের তাঁরা অবশ্য অল্পে তুষ্ট থাকতে শেখান!
ধনকুবেররা যেহেতু এখন বাধ্য হয়েই ট্যাক্সো যোগান
জনসাধারণ স্বার্থত্যাগেও অগ্রণী হোন—এই তাঁরা চান।
ভরপেট খেয়ে কর্তাব্যক্তি ক্ষুধার্তদের যে-বাণী শোনান :
'সুদিন আসবে বিস্ময়ভরা মনোহর দিন,—কেন ঘাবড়ান!'
দেশটাকে যাঁরা লুটেপুটে খেয়ে জাহান্নামের দুয়োরে পাঠান—
তাঁরাই বলেন, 'শাসনযন্ত্রে হেঁজিপেঁজি যেন নাক না গলান!'

অনুবাদ : সত্যব্রত ঘোষ

পূর্ব-রণাঙ্গনে যুদ্ধরত জার্মান সৈন্যদের প্রতি

আমার প্রিয় বন্ধুরা, যদি আজ আমি তোমাদের মধ্যে থাকতাম
যদি সুদূর পূর্বসীমান্তে তুষারমণ্ডিত রণক্ষেত্রে তোমাদেরই একজন হতাম,
হতাম লৌহশকট পরিবৃত তোমাদের মতো হাজারো সৈন্যের একজন;
তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের মতোই বলতাম :
অবশেষে নিশ্চয়ই আমরা ফিরে যাব আমাদের প্রিয়জনদের মধ্যে।
কিন্তু বন্ধুরা, আমার প্রিয় বন্ধুরা,
লৌহশিরস্ত্রাণের নীচে, মাথার মণিকোঠার মধ্যে
আমি কিন্তু জানতাম, ঠিক যেমনটি আজ তোমরাও জানো,
বাড়ী ফেরার পথ আমাদের চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছে।

স্কুলে-পড়া মানচিত্রে যখন বিভিন্ন দেশের অবস্থান দেখি,
তখন মনে হয় স্মোলেন্‌স্ক শহরটি কত কাছে—
ফ্যুয়েরারের ছোট্ট আঙুলটির দৈর্ঘ্যের চেয়েও কম দূরে,
অথচ এই বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্রে কিন্তু শহরটির দূরত্ব অনেক,
শহরটি অনেক—অনেক দূরে।
তুষারপাত কিন্তু চিরন্তন নয়, বসন্তকাল আসা পর্যন্ত তার দাপট,
সৈন্যদের জীবনও তো চিরদিনের নয়, আগামী বসন্তকাল পর্যন্ত
সে কিন্তু টিকে থাকতে পারবে না।
আমারও মৃত্যু হবে, সেকথা আমি ভালোভাবেই জানি
এবং পরদেশলুণ্ঠনকারী হিসাবে আমার মৃত্যু হবে
মরতে হবে নির্মম হত্যাকারীর পোশাকে।
হাজার হাজার হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারীর একজন রূপে চিহ্নিত করেই
আমার ওপর নেমে আসবে চরম আঘাত, আমাকে হত্যা করা হবে।
প্রিয় বন্ধুরা আমার, আমি যদি তোমাদের মতো একজন হতাম
তবে তোমাদের সাথেই তুষারস্তূপের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতাম
আর তখন তোমাদের মতোই আমিও প্রশ্ন করতাম ঃ
কেন, কি উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আনা হয়েছে,
যেখান থেকে বাড়ী ফেরার সমস্ত পথই আমাদের বন্ধ ?
কেন আমি নির্মম হত্যাকারীর পোশাক পরেছি ?
অবশ্যই আমি ক্ষুধার জ্বালায় এ কাজ করছি না,
এ কাজ করছি না আমার হত্যাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে।
এর একটি মাত্রই কারণ ঃ আজ আমি আজ্ঞাবাহী ক্রীতদাস,
আমাকে আদেশ করা হয়েছিল
আর আমি হত্যাকারীর পোশাক পরে নিয়েছিলাম।
এবং ঠিক সেই জন্যই আজ আমি মৃত্যুর সম্মুখীন
আমাকে হত্যা করা হবে নির্মমভাবে।
যেহেতু আমি আজ সেই দেশটিরই ধ্বংসকারীরূপে চিহ্নিত
যে-দেশটি শান্তিপ্রিয় কৃষক-শ্রমিকদের দেশ
যার মহান কর্মকাণ্ডে বিধৃত হচ্ছে নিরলস সৃষ্টির প্রয়াস
যার শস্যক্ষেত্র আর গোলাঘরগুলি আমরা চূর্ণবিচূর্ণ করেছি,

মিল, কারখানা, বাঁধগুলিকে করেছি ধ্বংস
শতসহস্র মনীষীর মহান শিক্ষাকে করেছি পদদলিত
আর অবমাননা করেছি মহান ব্যক্তিদের সমবেত চিন্তার সিদ্ধান্তগুলিকে।
তাই আজ আমাকে মরতে হবে ইঁদুরের মতো
যে ইঁদুরটা ধরা পড়েছে এক কৃষকের ফাঁদে।
আমাকে দিয়ে আজ পরিষ্কার করা হবে
পৃথিবীর জঞ্জাল, বিষাক্ত কুষ্ঠব্যাধি,
একটা উদাহরণ তৈরী করা হবে
ভবিষ্যতের জন্য আমাকে দিয়ে—
কোন্ ব্যবস্থা নিতে হবে হত্যাকারী আর লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে
আর যারা তাদেরই ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে।
চারিদিকে মাতৃহৃদয়ের ক্রন্দন, তাদের সন্তানেরা আর ফিরে এলো না
শিশুরা বলছে—সবাই তারা আজ পিতৃহীন
ধ্বংসস্তূপের কাছে এই হাহাকারের কোনো জবাব মিলছে না।
এবং আমি আর দেখতে পাব না, সেই দেশ
আমার প্রিয় দেশ, যে-দেশে আমি জন্মেছি
ব্যাভেরিয়ার সে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, দক্ষিণের পর্বতমালা
সেই সমুদ্র, সবুজ তৃণভূমি, পাইনের সারি,
শান্ত জনপদে প্রবহমান নদী-তীরের সেই আঙুরগুচ্ছ
অন্ধকার ভেদ করে ঊষার আগমন, মধ্যাহ্ন—
দিনান্তে সন্ধ্যার অভিসার।
সেই শহরগুলো আর সেই শহরটা, যেখানে আমি জন্মেছি
আমার সেই কাজ করার বেঞ্চিটা, আর সেই ঘরটা
আর সেই টুলটা—আমি আর কখনো দেখতে পাব না।
এর কিছুই আমি আর দেখতে পাব না
আর যারা আমার সঙ্গে এসেছে
তারাও কেউ একটি বারের জন্যও তা দেখতে পাবে না,
তুমি আমি কেউ আর আমাদের প্রেয়সী বা মায়েদের
সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পাব না
কিংবা শুনতে পাব না গ্রামের চিমনিতে ধাক্কা লাগা হাওয়ার শব্দ

অথবা শহরের সেই মিষ্টি হট্টগোল আর বিশ্রী আওয়াজ।
একটি বছরের মধ্যেই হয়তো আমি মারা যাব
কিন্তু জেনে রাখো—আমি জীবনে একবারও ভালোবাসা পাইনি
আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি, অস্ত্রে পরিণত হয়েছি এক কপট দেশচালকের।
আমার প্রকৃত শিক্ষা ছিল না, শেষ মুহূর্তে তা বুঝতে পারছি
হত্যা ছাড়া আমার আর কোনো বিদ্যাতেই হাতে খড়ি হয়নি
জল্লাদগুলোর কাছ থেকে ওর বেশী শেখার কিছু নেই।
যে-পৃথিবীকে আমি বিধ্বস্ত করেছি
তারই মাটির নিচে আমার কবর হবে,
আমি এক দুর্বৃত্ত, আমার ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান নেই,
কবরে আমার সংগী হবে শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস।
আর মাটির নিচেই বা কেমন হবে আমার অবস্থান?
একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে যেন পচন-ধরা একশ কেজি মাংসপিণ্ড।

তারও পরের অবস্থাটা কি?
যেন একটা শুকনো জড়পদার্থ দলা পাকিয়ে আছে,
একটা মাটির মণ্ড, যাকে শাবল দিয়ে তোলা হয়েছে
আর তার পচা গন্ধ চতুর্দিকে হাওয়ায় হাওয়ায় 'ম' 'ম' করছে।
আমার প্রিয় বন্ধুরা, আজ যদি আমি তোমাদের সংগে থাকতাম
সেই সুদূর স্মোলেনস্কের পথে,
তারপর সেই স্মোলেনস্ক থেকে অন্য এক অজানা পথে,
তখন আমি নিশ্চয় তেমনটিই অনুভব করতাম, যেমনটি তোমরা করছ
লৌহ-শিরস্ত্রাণের নিচে, মাথার মণিকোঠার মধ্যে সেই চিন্তাই আমার হতো;
অন্যায় সর্বদা অন্যায়ই!
দু' দু' গুণে চারই হয়।
তোমাদের সংগে যারা গেছে তারা অবশ্যই মারা যাবে
সেই রক্তপিপাসু দস্যুর দল,
হত্যাকামী নির্বোধের দল।
তারা জানত না মস্কো শহর অনেক দূরে,
অনেক—অনেক দূরে,

জানত না পূবের দেশগুলিতে শীত কী প্রচণ্ড,
শীত কত তীব্র !
আর জানত না সেই নতুন কৃষক ও শ্রমিকের রাষ্ট্রটি
তাদের গ্রাম ও শহরগুলিকে রক্ষা করবে,
আর আমাদের তারা নিশ্চিহ্ন করে দেবে
জঙ্গলের মধ্যে, কামানের সারির পেছনে
রাস্তায় আর বাড়ির মধ্যে,
ট্যাঙ্কগুলির নিচে আর পথের মোড়ে মোড়ে ;
সেই রাতের কঠিন শীতে, অনাহারে
আমাদের হত্যা করবে সেই দেশের পুরুষ, নারী আর শিশুরা,
এমনি করে আমরা সবাই মারা যাব
আজ কিংবা কাল অথবা পরের দিন
তুমি আমি এবং ওই জেনারেল সবাই।
কারণ, আমরা তাকেই ধ্বংস করতে চেয়েছি
যার সৃষ্টি মানুষের মহৎ প্রচেষ্টার মধ্যে।
যেহেতু কঠোর পরিশ্রমেই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি
যেহেতু একটি গৃহনির্মাণেও যথেষ্ট শ্রমের প্রয়োজন
লোহার কড়ি-বরগা সরাতে বা বাড়ির নক্‌শা আঁকতে,
একটা দেওয়াল তৈরী করতে, ছাদ ঢালাই করতে
আমরা অনেক পরিশ্রম করি ; কারণ, আশা আমাদের সুদূরপ্রসারী।
মানুষের সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে দেওয়া হবে না—
গত হাজার বছর ধরে একথাটা শুধু ঠাট্টার মতো বেজেছে
কিন্তু আজ সমস্ত মহাদেশেই এই কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে :
যে-পদযুগল নতুন ট্রাক্টরের চক্রচিহ্নিত জমিকে পদদলিত করবে
তাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে,
যে-হাত নতুন শহর-নির্মাতাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হবে
সে হাত টুকরো করে ফেলা হবে।

অনুবাদ : অমল মুখোপাধ্যায়

আমার দেশবাসীর উদ্দেশে

তোমরা যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলিতে আজও বেঁচে আছ,
অবশেষে কৃতকর্মের অনুশোচনাই তোমাদের সম্বল হলো ;
তোমাদের সৈন্যদের আর নতুন যুদ্ধে ঠেলে দিও না,
যেহেতু অতীতেও তারা সফলকাম হয়নি
তাই আমার অনুরোধ, আর যেন অনুশোচনা করতে না হয়।
তোমরা পুরুষেরা, সঙ্গীনটা ছুঁড়ে ফেলে কর্ণিকটা হাতে নাও,
অবশেষে তোমরা আজ আবার দেখছ কিছুটা স্বস্তির মুখ,
তোমরা বসে নেই বারুদের স্তূপের ওপর ;
আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তিতেই আছ,
তাই আমার অনুরোধ, সঙ্গীনটা ফেলে কর্ণিকটা হাতে নাও।

তোমরা শিশুরা, যাদের যুদ্ধের কালো হাত স্পর্শ করেনি,
তোমাদের অভিভাবকদের এবার প্রত্যয়ের সাথে বোঝাবে—
উচ্চৈঃস্বরে বলবে, তোমরা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বাঁচতে চাও না,
বড়রা যে-কষ্ট সহ্য করেছে, তোমাদের যেন তা সহ্য করতে না হয়,
তোমরা শিশুরা, যুদ্ধের কালো হাত যাদের স্পর্শ করেনি।

তোমরা মায়েরা, তোমাদের কর্তব্য নিজেরাই স্থির করো,
আমার অনুরোধ, তোমাদের শিশুদের বাঁচতে দাও,
তোমরা জন্ম দিয়েছ, মৃত্যু দিয়ে সেই জন্মকে কলঙ্কিত করো না,
তোমরা মায়েরা, তোমাদের শিশুদের বাঁচার মতো পৃথিবী করে দাও।

অনুবাদ : অমল মুখোপাধ্যায়

বেচারা বের্টোল্ট-এর জন্য

আমি, বের্টোল্ট ব্রেখ্ট, এসেছি কৃষ্ণ অরণ্য থেকে
আমার মা আমাকে ব'য়ে এনেছিলেন শহরে, আমি তখনো তাঁর পেটে
আর আজও লেগে আছে সেই অরণ্যের হিম
আমার অন্তরে সে বুঝি থেকে যাবে আমার শেষ দিনেও।

এই সিমেণ্ট-শহরে স্বচ্ছন্দ বোধ করি। শৈশব থেকেই
সব কিছু অতিরিক্ত পেয়ে আসা—সংবাদপত্রের প্রসাদ,
তামাকের, আর তেমনি ব্র্যাণ্ডিরও।
সন্দেহবাতিক মন, অলস, অথচ তুষ্ট শেষটায়।

মানুষের সঙ্গে আমি দোস্তি করি। আর
মাথায় একটা টুপি লাগাই অন্য সকলের মতো।
হয়তো কখনো ব'লে বসি: ওরা কটুগন্ধ জীব
আবার তখনই বলি: ঠিক আছে, আমিও তো তাই।

দুপুরের আগে আমার দোলানো চেয়ারটায় বসি,
দুপাশে স্ত্রীলোক দুজন,
তাদের দিকে অমনযোগী দৃষ্টিতে তাকাই আর বলি:
তোমাদের পাশে দেখ এই একটি পুরুষ, যার উপরে
তোমরা ভরসা করতে পারবে না।

সন্ধ্যার দিকে আমার চারপাশে কিছু লোক জমায়েত হয়;
পরস্পরকে আমরা সম্বোধন করি, 'মহাশয়' বলে।
তারা আমার টেবিলে পা তুলে দেয়
বলে: অবস্থার উন্নতি ঠিকই হবে। আমি জিজ্ঞেস করি না কবে।
ভোরের সময় ঝাউ গাছেরা প্রস্রাব করে ধূসর আলোয়
তাদের পরগাছা পাখির দল কিচমিচ শুরু করে দেয়।
শহরের সেই প্রহরে আমার গেলাশ শূন্য ক'রে দিই,
পাইপ ঝেড়ে ফেলি। তারপর অশান্ত ঘুম।

এই সব শহরের অবশিষ্ট থেকে যাবে শুধু বাতাস,
যা সেখানে ব'য়ে গেছে
বাড়ি তৈরি হয়েছিল ভোজের ফূর্তি বাড়াতে, এখন তা শূন্য।
জানি আমরা সাময়িককালের যন্ত্র বিশেষ
আমাদের পরে থাকবে—প্রায় কিছুই না।

তবু যে ভূমিকম্প অতঃপর আসবে তাতে আশা করব•
তিক্ততা এড়িয়েই নেভাতে পারব আমার চুরুটের আঁচ।
আমি বের্টোল্ট ব্রেখ্ট, পথ হারানো এই সিমেন্ট-শহরে,
এইখানে অরণ্য থেকে এনেছিলেন মা আমাকে বহুকাল আগে।

অনুবাদ : সমীর দাশগুপ্ত

যারা পাতের মাছটুকু তুলে নেয়

যারা পাতের মাছটুকু তুলে নেয়
তারা আমাদের শেখাতে চায় তুষ্ট থাকার বিদ্যা।
যাদের পকেটে ঠিক গিয়ে ঢুকবে ট্যাক্সের টাকা
তারা দাবি করে ত্যাগ।
যারা দুবেলা পেট ভরে খায় তারা ক্ষুধিতকে শোনায়
অনাগত ভবিষ্যের অপরূপ কথা।
যারা দেশকে নিয়ে যায় পাতালের পথে
তারা বলে শাসনকার্য চালাতে খাবি খাবে
রাম শ্যাম আর যদুর মতো লোক।

অনুবাদ : সমীর দাশগুপ্ত

ধন্যবাদের গান

স্তবগান করো এই রাত্রির, এই আঁধারের, যা তোমাদের চারিদিক ঘিরে!
ভিড়ে ভিড়ে একাকার হয়ে
চোখ মেলে দ্যাখো ঊর্ধ্বে অন্তরীক্ষে,
এখনই দিনমান তোমাদের ফেলে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

জয়গান গাও ঐ ঘাসের আর জীবজগতের—তোমাদের প্রতিবেশী,
যারা বাঁচে আর মরে যায়।
তোমাদেরই মতো প্রাণ
ঐ তৃণের এবং জন্তুর,
তোমাদেরই মতো মৃত্যুও ভাগ্যে তাদের।

বন্দনা করো এই বৃক্ষের, ঊর্ধ্বপথে চ'লে গেছে যে আপন আনন্দে
গলিত পিশিত থেকে দূরে অমর্ত্যের পানে
বন্দনা করো এই বৃক্ষের সেই স্খলিত আহার
এবং ঊর্ধ্বের আকাশকেও তেমনই অভিনন্দিত ক'রে।

হৃদয়ের অন্তর থেকে সাধুবাদ ক'র
আকাশের হেলাফেলাকেও
কারণ তার জানা নেই
তোমাদের কী নাম অথবা মুখের চেহারা
কেহই জানে না তোমরা এখনো এখানে আছ কিনা।

এই শীতলতা, একে ধন্যবাদ কর, এই বিকৃতিকে !
দূরে তাকিয়ে দ্যাখো :
তোমাদের কথা কেউ একটুও ভাবে না।
বিচলিত না-হয়ে তাই তোমাদেরই খুশিমতো তোমরা মরতে পারো।

অনুবাদ : সমীর দাশগুপ্ত

কি ভাবে কি হবে

['ডি মুটার' থেকে]

এক বাটি ডালও যদি তোমার জন্য নেই
কেমন ক'রে খাওয়া হবে তবে ?
রাষ্ট্রটাকে উল্টে দাও
মাথার উপর দাঁড় করিয়ে রাখো
যতক্ষণ না পাও প্রয়োজনের খাবার,
যতক্ষণ না তুমি হও তোমারই অতিথি।
কাজকর্ম, কিছুই যদি না পাও
কেমন ক'রে পেট চলবে তবে ?
রাষ্ট্রটাকে উল্টে দাও
মাথার উপর দাঁড় করিয়ে রাখো
যতক্ষণ না সব কারখানা-কল
কাজকর্ম তোমার মুঠোয় আসে।

রোগাপটকা,তোমায় দেখে ওরা যদি হাসে
কেমন ক'রে এগিয়ে যাবে তবে ?
আর যত লোক রোগাপটকা পাবে
তাদের ঠেলে ঢোকাও মিছিল-জাঠায়
যতক্ষণ না তুমিও হবে দারুণ শক্তিমান।
ওদের মুখে হাসিও মিলিয়ে যাবে।

অনুবাদ ঃ সমীর দাশগুপ্ত

শান্তির গান

[পাবলো নেরুদার কবিতা অবলম্বনে]

মাঠে মাঠে চাষ করে চাষী
সে জমি তো হ'তে পারে তার,
আসুক শান্তি নেমে সেই সব মাঠে।
হাজার হাজার বাড়ির শহরগুলো—
বাড়িগুলো তো হ'তে পারে তাদের
যারা এর বিশ্বকর্মা ; আসুক
শান্তি নেমে সেই সব শহরে শহরে।

শান্তি আমাদের সবাকার ঘরে ঘরে
শান্তি আসুক আমাদের প্রতিবেশীদের নীড়ে
তবেই তো আমরা সবাই হতে পারি সূর্যমুখী।
শান্তি নেমে এসো রেড্ স্কোয়ারে,
শান্তি নেমে এসো লিঙ্কন-সমাধি সৌধচূড়ে,
ব্রান্ডেনবার্গের দরজার মাথায় উড়ুক
শান্তির পতাকা, পাশে গর্বিত লাল-নিশান।
ভিয়েতনামের শিশুদের মুখে শান্তির আশ্বাস,
রুরের শ্রমিকের কাঁধে শান্তির পতাকা
নু-ইয়র্কের ট্যাক্সি চালকের হাতে হাত রেখে
চলছে সিংগাপুরের লড়াকু শ্রমিক।
জার্মান কৃষকদের ঘরে শান্তির গান,
লেনিনগ্রাদের অধ্যাপকেরাও যেন বাদ না যান।
ছোট বড় সবার জন্যেই শান্তি,
শান্তি ছড়িয়ে পড়ুক মাঠ পেরিয়ে,
সমুদ্র পেরিয়ে ; সারা দিগন্ত জুড়ে
ধ্বনিত হোক গান ঃ শুধু শান্তির গান।

অনুবাদ ঃ ডাঃ অসিত ঘোষ

মারি-এর স্মরণে

১

যেন কবে কোন নীলে নীল আশ্বিনে
নীরবে দু-জনে মিলেছি বকুল বনে
বেঁধেছি ত্রস্ত বাক্যবিহীন প্রিয়া
সে স্বপ্নশরীরিণী বাহু বন্ধনে।
মাথার উপরে শরতবেলার মেঘ
ছিল ভাসমান, চকিতে চক্ষে পড়ে,
সে-যে কী শুভ্র, সে-যে কী সুন্দর ছিল,
ফিরে তাকাতেই, দেখি তা গিয়েছে সরে।

২

আহা, দিন কাটে, কত-কত চাঁদ গেছে
স্তব্ধ আকাশ সাঁতরে কোথাও চলে ?
হয়তো বকুল গেছে কুড়োলের ঘায়ে
যদি-বা শুধাও, যে নারী বকুলতলে
ছিল সে কোথায়, বলি না, স্মরণে নাই
আমি জানি, কোন প্রশ্ন জড়িত মন—
ভাবি, কি জানি সে কেমন দেখতে ছিল
শুধু মনে পড়ে তার মুখে চুম্বন।

৩

আর সে চুমাও হারা তো বিস্মরণে
সে দিন আকাশ মেঘ না ভাসিয়ে দিলে,
মনে আছে সেই মেঘটুকু, মনে আছে
সে-যে কী-শুভ্র বুক ছিঁড়ে আসা নীলে।
হয়তো বকুলে ডাল ভরে আসে ফুল,
সে নারীরও কোলে আসে সপ্তম শিশু
আহা সেই মেঘ, ক'মিনিটই তার আয়ু
দেখেছি গেল তা হাওয়ায় হাওয়ায় মিশে।

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

জ্বলন্ত গৃহ-বিষয়ে গৌতমবুদ্ধের উপদেশ

তথাগত গৌতমবুদ্ধ উপদেশ দিচ্ছিলেন—
বলছিলেন, লোভের চাকায় আমরা সবাই বন্দী ;
তবু আকাঙ্ক্ষা যদি আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারি, তবেই
নিষ্কামভাবে প্রবেশ করব সেই পরম নাস্তিতে
—যার নাম নির্বাণ।
একদিন এক শ্রমণ প্রশ্ন করল করুণাঘনকে :
'এই নাস্তি কেমন, ভগবন ? আমাদের প্রত্যেকেই
না হয় ঝেড়ে ফেলব আমাদের আকাঙ্ক্ষা আপনার উপদেশ মতো—
তবু একবার বলুন
যে-নাস্তিতে আমরা প্রবেশ করব
তা বোধহয় সৃষ্টির অন্তর্গত নির্বিকার সত্তার মতো,
যখন কোন ব্যক্তি জলশয়নে থাকে, শরীর তার ভারশূন্য
সেই মধ্যাহ্ন বেলায়
সে তখন ঢের নির্বেদ, আলস্যে সে জলশয়নে হয়তো বা তন্দ্রাতুর
ভুলে যায় সে তার নিত্যকাজের পরম্পরা
অর্থাৎ, যেমন তার কম্বল ভাঁজ করার সময়
সে ডুবে যায় আচ্ছন্নতায়—কে জানে তাই পরম নাস্তি কিনা—
তা হলে এমনি ধারা ব্যাপারটাই সেই পরম সুখ
আনন্দঘন শান্তি, সুপ্তি।'
প্রভু আপনার এই নাস্তি কেবল নাস্তিই, শীতল নিশ্চেতন আর শূন্য।

বুদ্ধ রইলেন বহুক্ষণ স্তব্ধ, তারপর নির্বিকার ভাবে বললেন,
"সুভগ, তোমার প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।"

সেই সন্ধ্যাবেলায় যখন শিষ্যরা ফিরে গেছে
বুদ্ধ তখনো বসে আছেন ফলভারনত বৃক্ষতলে
যারা তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন সেই কাহিনী :
বৎসগণ, সম্প্রতি আমি একটি গৃহ দেখেছি অগ্নিময় জ্বলন্ত সেই গৃহ
আগুনের শিখা তার ছাদ লেহন করছে। আমি নিকটে গেলাম।
লক্ষ্য করলাম, বাসিন্দারা তখনো রয়ে গেছে সেই প্রজ্বলিত গৃহে।

আমি চৌকাঠ পার হয়ে বললাম,
যাদের মাথার উপরে ছাদ জবলছিল তাদের ডেকে বললাম,
দ্রুত গৃহটি ত্যাগ করতে, কিন্তু মনে হলো
ঐ জবলন্ত গৃহের বাসিন্দাদের কোনো তাড়াই নেই। একজন তাদের
যখন আগুন তার ভ্রূযুগলকে দগ্ধ করছিল, শুধালো :
'বাইরে যে যাব; বাইরেটা কেমন কে জানে, বাইরে কি কখনো
বৃষ্টি পড়ে না,
বাইরে কি ঝড় বয় না, তাদের জন্য তৈরি আছে তো আরেক বাড়ি',
এমনি ধারা নানা প্রশ্ন।
উত্তর না দিয়ে
আমি পুনরায় বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমি ভেবে দেখলাম ঐ বাসিন্দার
প্রশ্ন শেষ করার আগেই ভস্মসাৎ হবে।"

আর সত্যি বলতে কি, বন্ধুগণ, এখনো যে
মেঝের বুকে এমন ধারা উত্তাপ সয়নি
সে তো খুশি মনেই, বাড়ি বদল করে নেবে;
সে মানুষটিকেও আমার কিছুই বলার নেই"
গৌতম বুদ্ধ এমন কথাই বলেছিলেন।

কিন্তু আমরা, যাদের মাথা নোয়ানোর শিল্পকর্মে উৎসাহ নেই
বরং মন যাদের মাথা না নোয়ানোর জন্যে তৈরি
যারা নির্দিষ্ট ধরনের প্রস্তাবনায় এই পার্থিব প্রকৃতিতেই
মানুষজনকে আবেদন করে জানায়—
মানুষিক উৎপীড়কদের ঝেড়ে ফেলতে,
আমরাও মনে করি
যারা পুঁজির বোমারু বহর গজিয়ে ওঠার সময়
দিস্তা দিস্তা আজেবাজে প্রশ্নের বাহানা তোলে
তারা গোল্লায় যাক ;
আর যারা এটা কিভাবে করব, ওটাই বা কেমনভাবে করি
বিপ্লবের পর তাদের সঞ্চয়ের কি গতি হবে, কি গতি বা হবে তাদের
ছুটির দিনের ভালো পোশাক-আশাকের
সে বিষয়েও তাদের আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

মূলমন্ত্র

এই, তবে, এই-ই সব। যথেষ্ট তা' নয়, আমি জানি।
অন্তত এখনো আমি বেঁচে আছি, সে তুমিও জানো।
আমি যেন সেই লোক একটি ইট তুলে যে দেখায়
কেমন সুন্দর তার গৃহখানি ছিল একদিন।

অনুবাদ : যুগান্তর চক্রবর্তী

১৯৪০, ৬-সংখ্যক

আমার ছোট্ট ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে :
আমি কি অঙ্ক শিখবো ?
কী দরকার তার, আমার বলতে ইচ্ছে হয়। দু'-টুকরো রুটি যে
এক-টুকরোর চেয়ে বেশি
সে তুমি এমনিতেই বুঝতে পারবে।
আমার ছোট্ট ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে :
আমি কি ইংরেজি শিখবো ?
কী দরকার তার, আমার বলতে ইচ্ছে হয়। ওদের সাম্রাজ্যটা তো
ভেঙে পড়ছে।

স্রেফ পেটে হাত বুলোও আর গোঙাও
তাতে ঠিকই বোঝা যাবে তুমি কি বলতে চাইছো।
আমার ছোট্ট ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে :
আমি কি ইতিহাস শিখবো ?
কী দরকার তার, আমার বলতে ইচ্ছে হয়। মাটিতে মুখ গুঁজে
পড়ে থাকতে শিখলেই
শেষ পর্যন্ত টিঁকেও যেতে পারো এ-যাত্রা।

হ্যাঁ, শেখো গিয়ে অঙ্ক, আমি তাকে বলি
শেখো ইংরেজি, শেখো ইতিহাস !

অনুবাদ : যুগান্তর চক্রবর্তী

ধোঁয়া

দীঘির পাড়ে গাছপালার মধ্যে ছোট্ট বাড়িটি।
ছাদ বেয়ে ধোঁয়া উঠছে।
ওটুকু ছাড়া
কী বিশ্রীই না দেখাতো
বাড়ি, গাছপালা আর দীঘি।

অনুবাদ : যুগান্তর চক্রবর্তী

আমি সবসময় ভেবেছি

আমি সবসময় ভেবেছি : সেইসব শব্দই যথেষ্ট
যা সবচেয়ে সহজ। আমি যখন সবকিছুর কথা বলি
সকলের, বুকের ভেতরটা তখন নিশ্চয় ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে যায়।
নিজের পক্ষ নিয়ে না-দাঁড়ালে তুমি যে তলিয়ে যাবেই
তুমি নিশ্চয় সেটা বোঝো।

অনুবাদ : যুগান্তর চক্রবর্তী

সৈনিকের গান

মারণাস্ত্ররা ছড়াবে আগুন ঝলসাবে তরোয়াল
মৃত্যুশীতল জলেতে দাঁড়িয়ে হিম হয়ে যাবে দেহ
তারই মাঝখানে ঠিক রেখো মাথা নেমোনা তুষার ঝড়,
সতর্ক করে দিয়েছিল বউ চোখে শঙ্কিত স্নেহ।
সেদিন বীরের হুঁস ছিল নাকো অস্ত্রের সম্ভারে
হেঁকেছিল তাই স্ত্রীর মুখ চেয়ে গভীর অবিশ্বাসে
দামামার বোলে পা ফেলে সেদিন ছুটেছে অন্ধকারে।

দামামার ধ্বনি ঝরায় না খুন যুদ্ধ-ভূমির ঘাসে
ভয় করো নাকো বলেছিল ডেকে শঙ্কিত দয়িতারে
ছুরি ধরবার জন্যই নাকি তৈরি এ অংগুলি

উত্তর হতে দক্ষিণ নাকি বসে আছে তারই তরে
কবে সে দৃপ্ত পায়ে পায়ে এসে ওড়াবে পথের ধূলি।
দোহাই তোমার, যেও নাকো দূরে বিপদের মাঝখানে
প্রাজ্ঞজনেরা বারবার বলে যুদ্ধই মহাকাল
সে কথায় যদি করো পরিহাস হতে হবে অনুতপ্ত
বলেছিল বধূ, ফেলে দাও ছুঁড়ে হিংস্র এ তরোয়াল।
বীর সে তরুণ পিস্তল হাতে হেসেছিল উপহাসে
কি করে তুষার হিমহাতে তার ছোঁবে এ উষ্ণ দেহ
সদম্ভে ব'লে ঝাঁপ দিয়েছিল মৃত্যুশীতল স্রোতে
এ পারে দাঁড়িয়ে রইল দয়িতা চোখে শঙ্কিত স্নেহ।
যেতে যেতে ফিরে বলেছিল বীর দয়িতারে তার ডেকে
আমাদের দেখা হবে সে আবার পূর্ণ চাঁদের রাতে
শেষ হবে ক্ষণবিচ্ছেদ সেই মিলনের উত্তাপে
যে দিন দূরের পাহাড়ের চূড়া ধোয়া হবে জ্যোৎস্নাতে।
তুমি চলে গেছ যেমন ত্রস্ত চলে যায় কুয়াশারা
প'ড়ে আছে দিন উত্তাপহীন নমিত ক্লান্ত শোকে
আর প'ড়ে আছে গৌরব কিছু তোমারই তো ফেলে যাওয়া
গৌরবে ভরে উঠে না তিমির আশার সূর্যালোকে।
বলেছিলে বউ অস্ফুটে শুধু ঈশ্বর ওকে রেখো
বীর সে তরুণ এক হাতে ছুরি আর হাতে পিস্তল
তুষারের স্রোতে সঙিনের ভিড়ে কখনো গিয়েছে ডুবে
কখন যে তাকে নিথর করেছে মৃত্যুশীতল জল।
পাহাড়ের চূড়া ভেসে যায় সাদা জ্যোৎস্নার বন্যায়
বীর ভেসে গেছে কাল রাত্রির তুষারের ঘূর্ণিতে
কেন যে হে বীর, দয়িতা নারীর নিষেধটি শুনলে না
প্রাজ্ঞজনের ব'লে দেওয়া সীমা কেন গেলে চূর্ণিতে।
কীর্তি তোমার কোনদিন আর ঘনিষ্ঠ উত্তাপে
আতপ্ত করে দেবেনা প্রিয়ারে প্রখর রৌদ্রালোকে
তুমি চলে গেছ যেমন ত্রস্ত চলে যায় কুয়াশারা
প'ড়ে আছে দিন উত্তাপহীন নমিত ক্লান্ত শোকে।

অনুবাদ : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

কখনও না

তুমি যদি এখনও বেঁচে থাকো, কখনও বলো না : কখনও না !
যা নিশ্চিত ব'লে মনে হয় তা নিশ্চিত নয়।
জীবনযাত্রায় যা কিছু অস্তিমান তা স্থায়ী হবে না।

যখন শাসকের দল কথা বলেছে,
শোষিতেরা তাদের আওয়াজ তুলবে।
কে সাহস করে বলবে : কখনও না ?
পীড়ন আর অত্যাচারের শাসন যেখানে, তার জন্য কে অপরাধী ?
আমরা।
বিধান যেখানে ভেঙে চুরমার, তার জন্য দায়ী কে ?
আমরা।
বারবার প্রহারে যারা পরাজিত, সগর্বে মাথা তুলে তারা দাঁড়াবে !
যে কেউ নিঃশোষিত হোক না, সংগ্রামে জিতে ফিরে আসবে আবার !
যে মানুষ তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ?
আজকের যে শিকার, আগামীকালের সে বিজেতা
এবং আজকের অবস্থায় বদলে গেছে 'কখনও না'।

অনুবাদ : দিলীপ সেন

তিন পয়সার পালার একটি গান

মহীন্দ্র ॥ এই ফাঁকেতে ভদ্দর বাবু শুনুন দিয়ে মন
আপনাদেরই সামনে কিছু আছে নিবেদন।
পাপীতাপী ঢের লোকই যে নেই তাতে সন্দেহ
কিন্তু তাদের ভাত জোটে না জানেন কি তা কেহ ?
ভর পেটটাকে খাইয়ে দিয়ে তবে দেবেন জ্ঞান
জ্ঞানে দেখুন কাজ হয় না লাগেই পুলিশ ভ্যান।
শরীরটাতো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ।

নেপথ্যে ॥ মানুষ তবে বাঁচে কিসে ?

মহীন্দ্র ॥ মানুষ তবু বাঁচে কিসে শুনুন বাবু বলি,
লোক ঠকিয়ে লোক পিটিয়ে কেঁদে ক'কিয়ে
চুরিচামারি করেই বাবু ভরে সবাই থলি
মানুষ জাতি নিজের জাতি এই কথাটাই ভুলি।

নেপথ্যে ॥ অতএব মহাশয় শুনুন দিয়ে মন

সকলে ॥ বাঁচে যারা পাপী তারা
প্রমাণ করুন—নন্।

জ্যোৎস্না ॥ যখন বাবু বলেন আমরা খারাপ মেয়েছেলে
ভদ্দর মেয়ে ভালো মেয়ে যখন আমরা নই
তখন শুনুন একটা কথা পষ্ট করে কই
ভদ্দর মশাই থাকে না কেউ পেট ভ'রে না খেলে
দেরী হয়ে গেছে বাবু তবু লিখুন খাতায়
ভাত চাট্টি খেতেই হয় যখন বসি পাতায়
শরীরটা তো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ।

নেপথ্যে ॥ মানুষ তবে বাঁচে কিসে ?

জ্যোৎস্না ॥ মানুষ তবে বাঁচে কিসে শুনুন বাবু বলি,
লোক ঠকিয়ে লোক পিটিয়ে কেঁদে ক'কিয়ে
চুরিচামারি করেই বাবু ভরে সবাই থলি
মানুষ জাতি নিজের জাতি এই কথাটাই ভুলি।

নেপথ্যে ॥ অতএব মহাশয় শুনুন দিয়ে মন

একত্রে ॥ বাঁচে যারা পাপী তারা
প্রমাণ করুন—নন্।

অনুবাদ : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মারী ফারার-এর ভ্রূণহত্যা সম্পর্কে

মারী ফারার, জন্ম এপ্রিল মাসে
কোনো জন্মচিহ্ন নেই, অপ্রাপ্ত বয়স্ক !
পিতৃমাতৃহীন অনাথ
এ পর্যন্ত কোনও পুলিশ রেকর্ড নেই।

জানা গেছে, মেয়েটি নিম্নলিখিত
উপায়ে ভ্রূণ হত্যা করেছে ঃ
তার জবানীতে জানা যায়
যখন তার দ্বিতীয় মাস,
তখন মদের দোকানের এক ঝি-র সাহায্য নিয়ে
সে দুবার ডুশ নিয়েছিল, যাতে বাচ্চাটা পেট থেকে বেরিয়ে যায়।
জানা গেছে,
তাতে সে কষ্ট পেয়েছিল
কিন্তু কোনো ফল অর্শায় নি।
কিন্তু মশাই, আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান,
কেননা যে জন্মেছে,
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারারের জবানী ঃ
সে চুক্তিমত পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেয়
বুক আর পেট আঁট ক'রে বাঁধতে থাকে
মদের সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে খেতে শুরু করে
তাতে শরীরের মোক্ষণ হতে থাকে
কিন্তু শিশু বেড়েই চলে
বাসন ধুতে ধুতে তার শরীর যেন আর বয় না।
এখন এক নজরেই বোঝা যায়
পেটে কোনো গোলমাল
মেয়েটি স্বীকারোক্তি করে
তখনও সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক
দেবতার কাছে রোজ সে ভক্তিভরে প্রার্থনা শুরু করে
কিন্তু মশাই, আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

প্রার্থনার ফল হয় নি
সে সাহায্য চেয়েছিল
একদিন সকালবেলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল,
যখন হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছিল
তখন দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছিল তার।
দশমাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত
সে তার গোপন কথা গোপনেই রেখেছিল ;
কেউ বিশ্বাস করতে পারত না
এমন ঘটতে পারে,
এমন সাদামাটা মেয়েটার শরীর
এমন প্রলোভনের শিকার হতে পারে;
কিন্তু মশাই, আপনারা সব
রাগ ঘৃণাকে আটকান,
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারারের জবানবন্দী :
সেই বিশেষ দিনটি এলো,
তখন সকাল
সে সিঁড়ি ধুচ্ছিল,
হঠাৎ কে যেন একটা লম্বা পেরেক
তার তলপেট দিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দিল
যন্ত্রণায় তার শরীর মোচড় দিয়ে উঠল,
তখনও সে গোপন কথা গোপনই রাখল।
সারাদিন কাপড় ধুতে থাকল
আর মাথার মধ্যে দাপাদাপি চলতে লাগল।
তার মাথা ভার হয়ে এলো
পেটে বাচ্চা, বুক ভারী
অনেক রাতে বিছানায় গিয়ে এলিয়ে পড়ল।
কিন্তু মশাই, আপনারা সব

রাগ ঘৃণাকে আটকান;
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

শোওয়া মাত্রই আবার কাজের তলব এলো।
বাইরে বরফ পড়ছে
সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল মেয়েটা;
রাত এগারটায় কাজ শেষ।
বড় দীর্ঘ পরিশ্রান্ত দিন শেষ হলো।
পেট ছিঁড়ে বেরোবার জন্য ছটফট্ করছে বাচ্চাটা।
মারী ফারারের জবানবন্দী থেকে :
বাচ্চাটা জন্মালো; আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই দেখতে তাকে

কিন্তু মারী ফারার পাঁচটা মায়ের মতো নয়।
ঘেন্না করবেন না,
ছেলের জন্ম দিয়েছে যে-মা;
সে মা নয়ই বা কেন ?
কিন্তু মশাই; সাবধান
রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

যা বলছিলাম বলি;
যে ছেলে জন্মালো, তার কি হলো বলি,
মারী ফারারের জবানবন্দী :
এখন আর সে গো পনকথা গোপন রাখতে চায় না
কাজেই মশাইরা, বাকিটা শুনুন;
শুনে রায় দিন
সবে সে বিছানায় গিয়ে উঠেছে
ঘরে সে একা

সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে
জানে না কি হবে,
গোঙানি থামানোর জন্যে সে মুখে বালিশ চাপা দিল
আর আপনারা সব মশাইগণ; রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

ঘরে কনকনে শীত
তাই শেষ জোরটুকু সংহত ক'রে
ও নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাথরুমে
যতটা আদর ক'রে সম্ভব
বাচ্চার জন্ম দিল,
কখন জানে না
বোধহয় ভোরের দিকে
বাথরুমের খোলা ছাদ দিয়ে বরফ পড়ছে
কি ক'রে বাচ্চাকে ঢাকবে মা জানে না।
ঠাণ্ডায় হাতের আঙুল জমে আসছে; নীল হয়ে আসছে
কিন্তু মশাইগণ, সাবধান
রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

মারী ফারার বলছে ঃ
বাথরুম থেকে ঘরে যাবার পথে
বাচ্চাটা কেঁদে উঠল
চিল-চিৎকার;
ভয়ে পাগল হয়ে মারী তাকে কিল, চড়, ঘুষি মারতে লাগল
থেমে গেল বাচ্চা।
থেমে যাওয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে মারী তার বিছানায় ফিরল
সারা রাত বুকে বেঁধে রাখল শরীরটাকে
সকাল বেলায় আস্তাবলের নীচে

ঘুম পাড়িয়ে দিল।
মারী ফারার জন্ম এপ্রিল মাসে
কুমারী মা; শাস্তি পেয়ে জেলে মারা গেল
যে সমস্ত মানুষের পাপ বহন করছে।
ফর্সা চাদরের নীচে ডাক্তারের ছুরি কাঁচির সাহায্যে
যাঁরা সন্তানের জন্ম দেবেন
তাঁরা পুণ্যবতী জননী আখ্যা পাবেন
পুণ্যবান পিতৃবৃন্দ;
পুণ্যবতী মা জননীরা;
সাদামাটা একটা মেয়ে কামনার শিকার হয়েছিল
তাকে কুলটা বলবেন না,
তার পাপ ভয়ঙ্কর
যন্ত্রণা আরো বেশী
সুতরাং মশাইরা, সব রাগ ঘৃণাকে আটকান
কেননা যে জন্মেছে
সে জন্মানোদের সাহায্য চায়।

অনুবাদ : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেয়া চক্রবর্তী

আমার ভাই ছিল বৈমানিক

আমার ভাই ছিল বৈমানিক
একটা কার্ড পেল সে একদিন
বাস্কে পুরে তার জিনিসপত্তর
দক্ষিণের দিকে বাড়ালো পা।

দিগ্বিজয়ী ছিল আমার ভাই ;
এ-জাতির তো নাকি জায়গা কম !
সীমানা ভেঙে দেশ দখলদারি
আদ্যিকাল থেকে তাদের লোভ।

আমার ভাই তাবে বাগিয়েছিল
গুয়াদারামা ম্যাস্‌সিফের জমি,
দৈর্ঘ্যে ছয় ফিট দু-ইঞ্চি।
প্রস্থে চার ফিট ইঞ্চি ছয়।

অনুবাদ : অমিতাভ দাশগুপ্ত

শিশুদের ধর্মযুদ্ধ, ১৯৩৯

উনচল্লিশে পোল্যাণ্ডে ঘটেছিল
রক্তে ঢালাই যুদ্ধের কারবার।
অনেক শহর, অসংখ্য ছোট গ্রাম
উনচল্লিশে হয়ে গেল ছারখার।

উনচল্লিশে ভাইকে হারালো বোন,
যুদ্ধে বৌ-টি হারালো স্বামীকে তার।
খোকাবাবু ঘোরে আগুন-ছাইয়ের মাঝে
মা ও বাবাকে খুঁজে পায়নাকো আর।

পোল্যাণ্ড থেকে তো খবর বন্ধ হলো,
চিঠি তো বটেই, ছাপা কথা হলো মানা।
তবুও এখানে পূর্বদিকে সব দেশে
অবাক গল্প পথেঘাটে গেল জানা।

গল্পটি ওরা যখন বলত খুলে,
শিশুদের সেই ধর্মযুদ্ধ নিয়ে,
পোল্যাণ্ডে যার শুরু উনচল্লিশে,
শীত ঢেকে দিত পুবের শহর তুষারের ঢাকা দিয়ে।

বড় রাস্তায় সারি করে দল বেঁধে
উপবাসী ঐ শিশুরা খুঁড়িয়ে চলে।
পথে যেতে যেতে লুণ্ঠিত ভাঙা গাঁয়ে
নতুন সভ্য যোগ দেয় এসে দলে।

মারামারি থেকে পালাতে চেয়েছে তারা
এ বিভীষিকায় খুঁজেছিল ক্ষান্তিকে।
ভেবেছিল তারা খুঁজে পাবে একদিন,
সে দেশ যেখানে পাবে তারা শান্তিকে।

তাদের একটা সর্দার ছিল খুদে,
সে ছিল তাদের ভরসা এবং খুঁটি।
এ সর্দারের একটিই মাথাব্যথা
অজ্ঞাত ছিল পথের নিশানা দুটি।

একরত্তি এ একাদশী এক মেয়ে
চারবছরের বাচ্চাকে নিয়ে চলায় নেইতো শেষ।
মাতৃত্বের পনেরো আনাই পুরো,
বাকী শুধু ছিল অশান্তিহীন ছোট্ট একটি দেশ।

ইহুদীর ছেলে হাঁটছিল এই দলে।
গলায়, হাতায় ভেল্‌ভেট ছিল তার,
ধপ্‌ধপে সাদা রুটি খাওয়া অভ্যাস।
তবুও সেও তো লড়েছিল জোরদার।

আর দুই ভাই যোগ দিল সেনাদলে,
দুজনেরই মাথা অজস্র প্যাঁচে ভরা।
বৃষ্টির সাথে ল'ড়ে ভাঙা এক কুঁড়ে
ঝড়ের মতন দখল করল তারা।

হাঁটছিল এক সভ্য সে রোগা কালো,
পথের ধারেতে, আলাদা ও একা একা,
দুর্বহ বোঝা অপরাধ তার এই
কাঁধে এক তার নাৎসী চিহ্ন লেখা।

তাদের মধ্যে এক ছিল সুরকার,
ঢোলক একটা পেয়েছিল খুঁজে ভাঙাচোরা এক গাঁয়ে ;
ছিল না সেটাকে বাজানোর অনুমতি
পাছে শব্দতে তারা ধরা পড়ে যায়।

ছোট্ট একটা কুকুরও ছিল এ দলে,
ঠিক ছিল সেটা হাড়িকাঠে হবে বাঁধা।
হলো সে শেষটা খাবারের ভাগীদার,
যেহেতু সকলে মনে মনে দিল বাধা।

তাদের একটা ইস্কুলও ছিল খোলা,
খুদে মাস্টার জানত : চেঁচানো মানেই শিক্ষাদান।
ছাত্র একটি ভাঙা ট্যাঙ্কের গায়ে
লিখতে পারত শান্তির শুধু 'শান্...'।

গানবাজনাও হয়েছিল একদিন :
গর্জনশালী শীতের নদীর পাশে
একজন বসে ড্রামটা বাজালো কষে,
বড়ই দুঃখ কেউই শুনল না সে।

প্রেমের নজীরও ছিল বটে একখানা,
মেয়েটি বারো ও ছেলেটি পনেরো বছর;
নির্জন এক ভাঙা উঠোনের মাঝে
মেয়েটি ছেলের চুল আঁচড়ায় চঁাচর।

বেশিদিন ধরে টিঁকল নাকো এ প্রেম,
দিনগুলি ক্রমে ঠাণ্ডায় এলো জমে।
ছোট্টগাছই বা কী করে ফোটাবে ফুল,
তুষারের ঝড় কখনো যদি না কমে?

ছোটখাট এক যুদ্ধও হলো, যবে
এদের মতন আরেকটা দল এলো।
ওদের যুদ্ধ সহজে খতম হলো,
যেহেতু নেহাৎই 'অর্থহীন' ও খেলো।

কিন্তু যখন যুদ্ধ চলছে জোর,
বোমায় ভগ্ন, পয়েণ্টসম্যানের কুঁড়েঘরটাকে ঘিরে,
লক্ষ্য করল একটা দলের লোকে
খাবার আনার লোক আসছে না ফিরে।

অন্যদলের সেনারা শুনে সে কথা
একটা লোককে পাঠালো তাদের কাছে,
কাঁধে তার ছিল বস্তাভর্তি আলু,
খাবার অভাবে যুদ্ধটা মরে পাছে।

একটা বিচারও হয়েছিল এক রাতে,
আলোর জন্য দুটো মোমবাতি জ্বলে।
অনেক জটিল বিচারের পর সবে
ঘোষণা করল বিচারক দোষী ব'লে।

একটি ছেলের শবযাত্রাও হলো
গলায় ও হাতে ভেলভেট ছিল যার।
দুজন পোল ও দুই জার্মান মিলে
বয়ে নিয়ে তাকে রাখল কবরে তার।

প্রোটেস্টাণ্ট ও নাৎসী ও ক্যাথলিক,
সকলেই ছিল, যখন নামালো তাকে।
সব শেষে এক খুদে সোশ্যালিস্ট উঠে
জীবিত সবার ভবিষ্যৎকে দু'চার কথায় আঁকে।

আশাবিশ্বাস অভাব ছিল না মোটে
মাংস ও গম, অভাব মাত্র দুটি।
তাদের দুষো না আশ্রয় নেই শুনে
যদি চুরি করে তোমার একটা রুটি।

আর, কেউ যেন গরীবকেও না দোষে,
রুটি-ভাত দেওয়া কুলোয় না ক্ষমতায়,
পঞ্চাশজন খাওয়াতে যা লাগে সেটা
নেহাৎই ময়দা, আত্মত্যাগ নয়।

মোটামুটি তারা দক্ষিণে চলছিল
দক্ষিণদেশে—রক্তসূর্য যেথা।
দুপুরবেলায় ঠিক বারোটার কালে
সূর্য যেথায় মাথার ওপরে, সেথা।

অবশ্য তারা এক সৈন্যকে পেল,
আহত হয়ে সে পড়েছিল ফার গাছে,
সাতদিন ধরে করল প্রচুর সেবা
যাতে জানা যায় পথটা কোথায় আছে।

বলল সে শেষে: 'বিলগোরে চলে যাও!'
জ্বরের বিকার অনেক গড়িয়েছিল।
অষ্টমদিনে মৃত সেনাটিকে ওরা
কবরে শুইয়ে আবার এগিয়েছিল।

পথেই অনেক নিশানার পোস্ট ছিল
যদিও তুষারে কালিটা গিয়েছে ধুয়ে
আর সে নিশানা ঠিক পথ দেখাতো না,
সেগুলো যে ছিল দুমড়িয়ে বেঁকে নুয়ে।

মর্মান্তিক ঠাট্টা কোনো এ নয়,
প্রচলিত এক যুদ্ধেরই এই প্রথা।
অনেক ঘুরেও তবু হলো নাকো জানা
বিলগোরে ব'লে জায়গাটা হবে কোথা।

দাঁড়াল নেতাকে চারদিক থেকে ঘিরে,
নেতাটি সামনে বরফ-হাওয়ার ঘোরে
ছোট্ট হাতটা মহা কায়দায় তুলে
বললে, 'ওদিকে হবে এই বিলগোরে'।

একরাতে এক আগুন দেখল তারা
'না যাওয়াই ভালো', তারা ঠিক করে নিল
একবার তিন ট্যাঙ্ক গেল পাশ দিয়ে;
প্রতিটির মাঝে কিছু করে লোক ছিল।

একবার তারা শহরের কাছে এলো,
এড়িয়ে এগোলো শহরটা রেখে ধারে।
যতদিনে তারা অনেকটা এগিয়েছে
ততদিন তারা চললো অন্ধকারে।

আগে যেটা ছিল দক্ষিণ-পূব পোল্যাণ্ড
তুষার সে দেশে মুছলো সবুজ লেখা,
পঞ্চান্নটি শিশুর দলকে সেই
সেখানে তখন শেষবার গেছে দেখা।

আমি যদি শুধু দুটো চোখ বুজে ভাবি
তাদের চলাটা চোখের সামনে ফোটে!
বোমায় চূর্ণ একটি বাড়ীর থেকে
বোমায় চূর্ণ আরেক বাড়ীতে ওঠে।

তাদের ওপরে মেঘের রাজ্যে দেখি
আরও কত সব লম্বা লাইন মেলে
খুঁড়িয়ে চলেছে, শীতল বাতাস মুখে,
ঘরছাড়া আর পথহারা সব ছেলে।

খুঁজে ফেরে তারা শান্তিপূর্ণ দেশ
আগুনে এবং বজ্রের দ্যুতিহীন,
যে-দেশ ছেড়েছে সে-দেশের মতো নয় ;
শোভাযাত্রাটা বেড়ে চলে দিনদিন।

তারপরে সেই আলো-আঁধারির মাঝে
সন্দেহ হয় : সবাই তো এক নয় !
আধচেনা সব আরো কচি মুখ দেখি,
স্প্যানিশ, ফরাসী, পীতকায়ও মনে হয়।

জানুয়ারী মাসে পোল্যাণ্ডে সে-বছরে
ঘরছাড়া এক কুকুর পড়ল ধরা।
ঝুলছিল তার শীর্ণ গলায় লেখা
পিচবোর্ড এক, হস্তাক্ষরে ভরা।

তাতে ছিল লেখা : 'বাঁচাও এখানে এসে
পথ হারিয়েছি আমরা এখানে সবে।
আমরা এখানে পঞ্চান্নটি প্রাণ
চেয়ে বসে আছি কুকুর ফিরবে কবে।'

'একে গুলি করে মেরো নাকো কভু যেন
ঠিকানা ও পথ ভালো জানা আছে এর,
এর ওপরেই আমাদের নির্ভর
জীবনের শেষ ভরসা এ আমাদের।'

বাচ্চার লেখা অক্ষরগুলো কাঁচা
কয়েকটি চাষী পড়েছিল ধরে ধরে,
তারপর থেকে দেড়বছর তো হলো
উপবাসী সেই কুকুরটা গেছে মরে।

অনুবাদ : জিষ্ণু দে

দেশান্তরী আখ্যা প্রসঙ্গে

সবসময় দেখেছি লোকে ভুল করে
যখন আমাদের বলে ঃ দেশান্তরী।
ব্যাপারটা অবশ্যই দেশান্তর। কিন্তু এ নয়
কোনো স্বাধীন ইচ্ছায়, দিলপসন্দ
এক অন্য দেশে যাওয়া ; এ-ও নয়
কোনো অন্য দেশে যাওয়া, থিথু হওয়া
আর সম্ভবত সেখানে বরাবর থাকা।
বলা যায়, আমরা পালাই, বিতাড়িত হই কিংবা বহিষ্কৃত।
ঘর-দোর নয়, যে-দেশে গিয়ে উঠি
তা কেবল নির্বাসন আমাদের।
উচাটন বসে থাকি, সম্ভবত সীমান্তের কাছাকাছি কোনোখানে
কাল কাটে ফেরার প্রতীক্ষায় ; চোখ রাখি
ওপারে কখন কতটুকু বদলায় ; নতুন যে আসে
তাকে আগ্রহে শুধাই, একে একে মনে করি, আর
খুঁটিনাটি খবর-টবর সব কিছু জানি।
হায়, স্তব্ধ নান্দীরোল ভোলায় না আমাদের !
কানের ভেতর দিয়ে মর্মে এসে পশে বীভৎস শীৎকার,
তাদের শিবির থেকে, সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে
যা-আসে, শুনি তার নগ্ন বিবরণী।
আমরা সবাই
যারা ছেঁড়াফাটা চটি পায়ে ভিড়ভাট্টা ঠেঙ্গাই
তুলে ধরি লজ্জার দাগ,
বলি, এ-আমার দেশের তিলক
কিন্তু কেউই আমরা
থাকব না এখানে। শেষ কথা
বাকি আছে বলা।

অনুবাদ ঃ নীহাররঞ্জন বাগ

মৃত্যু-দিবসে লেনিন-আলেখ্য

১

গল্প আছে—
লেনিন যখন মারা গেলেন,
সমাধিসান্ত্রীদের একজন তার সঙ্গীকে
বলেছিল : আমি বিশ্বাস করতে চাইনি,
গেলাম সেখানে, লেনিন যেখানে শুয়ে,
তাঁর কানের কাছে চেঁচিয়ে বললাম, 'ইলিচ,
শোষকেরা আসছে !'
একটুও নড়লেন না তিনি। তখন বুঝলাম,
তিনি মারা গেছেন।

২

যদি কোনো মহান মানুষ চলে যেতে চান
কিসে তাঁকে আটকাবে ?
তাকে বলে : যে কারণে তিনি অপরিহার্য
তাই তাঁকে ধরে রাখে।

৩

লেনিনকে তবে কিসে আটকানো যেত ?

৪

সৈনিকটি ভাবছিল :
তাঁর যদি কানে ঢোকে শোষকেরা এসে গেছে
অসুস্থ হলেও তিনি উঠে বসবেন।
হয়তো ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি আসবেন
হয়তো শরীরটাকে টেনেটুনে তিনি আনবেন
কিন্তু তিনি উঠে বসবেন, আসবেন
আর শোষকের বিরুদ্ধে তিনি লড়বেন।

৫

সৈনিকটি একথাই জানতো, লেনিন
আজীবন
শোষকের বিরুদ্ধে লড়েছেন।

৬

আর সৈনিকটি যখন শীতপ্রাসাদ দখলের
যুদ্ধে অংশ নেবার পর
বাড়ি যেতে চাইল, কেননা বাবুমশাইদের
জমিজিরেৎ কবেই তো ভাগ-বাঁটোয়ারা শেষ;
লেনিন বললেন :
আর কিছুকাল থাকো,
শোষকেরা রয়েছে এখনও।
এবং যদ্দিন শোষণ রয়েছে
যুদ্ধও চলবে তদ্দিন,
যতদিন তুমি আছো
ততদিন তোমার যুদ্ধও।

৭

দুর্বলেরা যুদ্ধ করে না। সবলেরা
ঘণ্টাটাক বড়জোর।
যারা আরও কিছু বলীয়ান তারা করে
অনেক বছর। আর
বলিষ্ঠেরা সমগ্র জীবন
—এই হ'লো বলীদের ব্যাকরণ।

৮

[বিপ্লবীর প্রশস্তি]
যখন শোষণ মাত্রা ছাড়ে
অনেকে নিরুদ্যম
কিন্তু তাঁর উদ্যম বাড়ে।

তাঁর যুদ্ধ সংগঠিত হয়
মজুরির আর পানীয়ের
আর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের।

মালিকেরা প্রশ্ন করেন,
কোত্থেকে তুমি এলে ?
প্রশ্ন করেন দার্শনিকদের—
কার সেবাদাস তুমি ?
কারো মুখে যেখানে রা নেই
সেখানেই তিনি সোচ্চার।
আর শোষণ যেখানে কায়েম
এবং কথাটা ভাগ্য নিয়ে
সেখানেই তিনি সাফসাফ বলে দেন।

টেবিলে বসলে
খুলে দেন অসন্তোষের থলি ঃ
অতি জঘন্য আমাদের খাদ্য
যেখানে মাথা গুঁজি ঝুপড়ির বেহদ্দ ;
যেদিকে ওরা তাঁকে তাড়া দেয়
বিদ্রোহ জ্বলে ওঠে, এবং যেখানে
করুক অন্তরীণ
সেখানে ঘনায় ঘোর অশান্ত দিন।

৯
লেনিন প্রয়াত, অনুপস্থিত তিনি ;
জয় করায়ত্ত বটে কিন্তু দেশ বিধ্বস্ত তখনও।
জনগণ উঠেছেন জেগে, কিন্তু
তখনও পথ অন্ধকারে।
লেনিন আর নেই—
ফৌজিরা বসেছে পাথরে—চোখে জল,
শ্রমিকেরা যন্ত্র ছেড়ে এসেছে বেরিয়ে
মুঠো থরোথরো, দুর্বল।

১০
লেনিন চলে যান, যেন
গাছ তার পাতাদের বলে ঃ
যাই।

১১

তারপর কেটে গেছে পনের বছর।
এক-ষষ্ঠাংশ পৃথিবী
শোষণের থেকে মুক্ত।
"শোষকেরা আসছে"—এই ডাকে
নতুন যুদ্ধের জন্য জনগণ
নিয়ত প্রস্তুত।

১২

লেনিন ঘুমিয়ে
শ্রমিকের বিশাল হৃদয়ে।
আমাদের শিক্ষক লেনিন
সহযোদ্ধা আমাদের
লেনিন শায়িত—
শ্রমিকের বিশাল হৃদয়ে।

অনুবাদ ঃ নীহাররঞ্জন বাগ

পার্টিটা কে?

তো পার্টিটা কে?
সে কি ঘরের ভেতর টেলিফোনে বসে থাকে?
তার চিন্তাভাবনা কি গোপনীয়, আর
সিদ্ধান্তসূচী খুব দুর্গম দুর্জ্ঞেয়?
তবে পার্টিটা কে?

পার্টি তো আমরাই।
তুমি আর আমি তোমরা—সকলে আমরা।
তোমারই জামাটা তার পরিধেয়,
কমরেড, তোমারই মগজে সে ভাবে।
যেখানে আমি থাকি তার সেখানে ঘরবাড়ি
যেখানে আক্রান্ত তুমি
সেখানে ঝলক দেয় তার তরবারি।

দেখাও আমাদের পথ, যে-পথে যাওয়া উচিত
সেখানে তুমি হবে অনুসরণীয়
কিন্তু আমাদের ফেলে তুমি যেওনা এক পা-ও;
হোক তা ঠিক
আমরা ছাড়া
তা নিতান্ত ভ্রান্ত।

আমাদের থেকে তুমি আলাদা হ'য়ো না
আমাদের ভুল হতে পারে, এবং ঠিক হ'তে পারো
তুমি পার্টি
কিন্তু তা যেন না হয় আলাদা হওয়ার মাপকাঠি।
দীর্ঘ পথের চেয়ে হ্রস্বপথ ঢের বেশি ভালো; কেউই
তা অস্বীকার করে না
কিন্তু কেউ যদি তা জানে, এবং জেনেও
আমাদের না পারে দর্শাতে
থোড়াই যায় আসে; সে-জানার খয়রাতে।

আমাদের নিয়ে ক্রান্তদর্শী হও
আলাদা করো না আমাদের থেকে তোমাকে।

অনুবাদ : নীহাররঞ্জন বাগ

উড়িয়ে দাও গোটা দেওয়ালটা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়
সান্ কার্লোতে, ইতালির এক জেলের খুপরিতে—
যেখানে বন্দী সব জওয়ান; মাতাল আর চোরদের
রাখা হতো একসঙ্গে
কবে এক সমাজবাদী জওয়ান
একটা কপিং-পেন্সিল দিয়ে
দেয়ালে আঁচড় কেটে লিখেছিল :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।

ওপরের সেই খুপচি খুপরির মধ্য
দেখা যায় কি যায় না,
কিন্তু বিরাট বিরাট অক্ষরে ছিল সেই লেখা।
জেলসাহেবরা যখন তা দেখল, ওরা পাঠিয়ে দিল
এক রঙ-মিস্তিরি,
এক বালতি চুন এনে
ছোট একটা কুচি দিয়ে চুনকাম ক'রে দিল সেই
ভয়-দেখানো লেখা।
কিন্তু ও তো চুনকাম করেছিল শুধু অক্ষরগুলো
তাই খুপরির মাথায় এখন দাঁড়িয়ে রইল চুন দিয়ে লেখা :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
তখন এলো আরেকজন রঙ-মিস্তিরি—
মোটা বুরুশ দিয়ে
গোটা দেয়ালটা দিল রঙ ক'রে,
এমনভাবে যে অনেক ঘণ্টা ধ'রে আর
লেখাটা দেখাই গেল না।
কিন্তু সকালবেলা
চুন যখন গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে এলো আবার :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন!
এবার জেলসাহেবরা পাঠাল এক খোদাইকারকে
ছুরি দিয়ে সে তুলে ফেলবে লেখা!
অক্ষরের পর অক্ষর সে চেঁছে তুলল
এক ঘণ্টা বসে।
যখন তার কাজ শেষ হ'লো, খুপরির ওপর থেকে
চেয়ে রইল রঙছুট
গম্ভীর আর কুঁদে-ওঠা—দুর্জয় সেই লেখা :
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন!
এখন তবে উড়িয়ে দাও গোটা দেওয়ালটা,
জওয়ানটি বলে উঠল।

অনুবাদ : শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়

লোকের কাছে আমার কথা যা শুনেছি

সর্বদা ওরা আমায় বলত, আমি নাকি যুদ্ধের বিরুদ্ধে
সেজন্য বোকা, কিন্তু তা ছিল মূর্খামিতে ভরা এক বাক্য,
বলতে গেলে ওটা একটা উপলক্ষ্য।
আমিও বলতে চাইতাম ঃ
যুদ্ধ আমার এবং অন্যের কাছে অপ্রীতিকর,
তাই আমি যুদ্ধের প্রতিকূলে।
যুদ্ধ সম্বন্ধে আমি যা বুঝতাম, তা থেকে এটাই আমি বলতাম-
যদি আমার এবং অন্যের কাছে
শান্তি হয় যুদ্ধের থেকে আরও বেশী অপ্রীতিকর
তবে আমি হব যুদ্ধের অনুকূলে।

অনুবাদ ঃ শুভেন্দুবিকাশ নাথ

কর্ণিক

আমি ছিলাম একজন রাজমিস্ত্রী—এক স্বপ্নে।
হাতে কর্ণিক নিয়ে
দাঁড়িয়েছিলাম এক অট্টালিকার ওপরে।
কিন্তু যখনই ঝুঁকলাম মসলার দিকে
একটা আঘাত এসে বিচ্ছিন্ন করল আমাকে
কর্ণিকের অর্ধেক লোহা থেকে।

অনুবাদ ঃ অনুপ সাহা

তাপ্পি এবং কোটের গান

যখনই, আমাদের কোট ছিঁড়ে যায়
তোমরা দৌড়ে আসো এবং বলো ঃ এভাবে আর চলতে পারে না !
এদের সাহায্য করতেই হবে এবং সব উপায়ে !
আর প্রচুর উৎসাহে তোমরা ছুটে যাও কর্তাদের কাছে।
এদিকে আমরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অপেক্ষা করি,

এবং তোমরা ফিরে আসো আর উল্লাসে
আমাদের দেখাও তোমরা আমাদের জন্য কী জিতে এনেছ
একটা ছোট্ট তাপ্পি।
ভালোকথা, এটা সেই তাপ্পিটা
কিন্তু
আস্ত কোটটা কোথায়?

যখনই আমরা খিদেয় চিৎকার করে উঠি
তোমরা দৌড়ে আসো এবং বলো: এভাবে আর চলতে পারে না!
এদের সাহায্য করতেই হবে এবং সব উপায়ে!
আর প্রচুর উৎসাহে তোমরা ছুটে যাও কর্তাদের কাছে
এদিকে আমরা প্রচণ্ড খিদেয় অপেক্ষা করি।
এবং তোমরা ফিরে আসো আর উল্লাসে
আমাদের দেখাও তোমরা আমাদের জন্য কী জিতে এনেছ
একটা রুটির ছোট্ট টুকরো।
ভালোকথা, এটা সেই রুটির ছোট্ট টুকরো

আস্ত রুটিটা কোথায়?

আমরা কেবল তাপ্পিটাই চাই না
আমরা আস্ত কোটটাও চাই।
আমরা কেবল রুটির টুকরোটাই চাই না
আমরা আস্ত রুটিটাও চাই।
আমরা কেবল কাজের জায়গাটাই চাই না
আমরা চাই সমস্ত কারখানাটা
এবং কয়লা আর কাঁচামাল এবং রাষ্ট্রক্ষমতা।
ভালোকথা, এইগুলোই আমরা চাই—
কিন্তু
তোমরা আমাদের কী দিচ্ছ?

অনুবাদ: সুব্রতনারায়ণ চৌধুরী

পরিশিষ্ট

কেমন করে কবিতা পড়া উচিত

বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট

তোমরা আমার কবিতা নিয়ে নাড়াচাড়া করছ। কবিতা কেমন করে পড়া উচিত প্রায়ই অনেকে তা আমার আছে জানতে চায়; তাছাড়া অভিজ্ঞতা থেকেও জানি, ছোটবেলায় আমরা কত কম উপভোগ করি পড়ার বই-এর কবিতাগুলো; তাই আমি কয়েক ছত্র লিখতে চাই, আমার মতে কেমন করে কবিতা তৃপ্তির সঙ্গে পড়া যেতে পারে—এ বিষয়ে।

কবিতা সবসময়ই ক্যানারি পাখির কূজনের মতো নয়। ঐ পাখির গান সুন্দর, কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়। ভেতরের সৌন্দর্যকে বের করে আনার জন্য কবিতাকে কিন্তু থেমে থেমে পড়তে হয়। উদাহরণ হিসেবে আমি উল্লেখ করছি ইয়োহানেস এ্যার বেশারের 'ডয়েচলাণ্ট' গানটির প্রথম স্তবকটির কথা; ওটা তোমরা নিশ্চয়ই হান্স আইসলারের দেওয়া সুরে গেয়েছ:

> 'স্বদেশ, আমার যন্ত্রণা—
> গোধূলিতে তুমি ঢাকা,
> আকাশ, আমার গাঢ়তর নীল আকাশ—
> তুমিই আমার শান্তি।'

এর মধ্যে কি আছে যা' সুন্দর?

এই কবি তাঁর স্বদেশকে বলেছেন 'গোধূলিতে ঢাকা'। গোধূলি হ'লো দিন ও রাতের মাঝখানের একটি সময়, অথবা রাত ও দিনের, যখন আলো হারিয়ে যায় অন্ধকারে অথবা অন্ধকার আলোয়। এ হলো সেই ধূসর মুহূর্ত, যাকে ফরাসীরা বলে—'Entre chien et loup', যার জার্মান হ'লো—'Zwischen Hund und wolf', অর্থাৎ সেই সময়, যখন মানুষ ভালোর থেকে মন্দকে পৃথক করতে পারে না। এইরকম এক গোধূলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি তাঁর নিজের দেশে, যখন ফ্যাসিজম ও অমানুষিকতার অন্ধকার আগতপ্রায়, এবং সমাজবাদের প্রত্যুষ আসন্ন। এই জন্যই কবির কাছে তাঁর স্বদেশ—'স্বদেশ, আমার যন্ত্রণা' এবং একই সঙ্গে 'তুমিই আমার শান্তি'। আর সবসময় তাঁর চিন্তাকে

আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর স্বদেশের সৌন্দর্য, যার কথা রয়েছে তৃতীয় পংক্তিতে ('আকাশ, আমার গাঢ়তর নীল আকাশ')। এই সৌন্দর্য অনাহত, এমনকি নেকড়ের রাজত্বেও।

এই হলো কবিতাটির মর্মবাণী। এবং এ সুন্দর—কেননা কবির অনুভূতি গভীর ও মহৎ, কেননা কবি তাঁর দেশকে ভালোবাসেন—যন্ত্রণায় যখন অশুভের শাসন, এবং সুখে যখন শুভ প্রতিষ্ঠিত।

প্রকৃতই যথেষ্ট সৌন্দর্য রয়েছে কবির বলার ভঙ্গির মধ্যে। 'স্বদেশ, আমার যন্ত্রণা'—কথাটা এর থেকে ভালো করে বলা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় ভালোতর করে বলা—'তুমিই আমার শান্তি'। এ যেন এমন কোনো লোক যে শোকে আক্রান্ত এবং আচ্ছাদিত কালো পোশাকে; সেই লোক যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কেন তার যন্ত্রণা এবং সে উত্তরে বলছে: 'আমার দেশ এখন ঘাতকদের কবলে'। আবার একই সঙ্গে, এ হলো এক উৎফুল্ল এবং সঙ্গীতমুখর মানুষ, উৎফুল্ল ও সঙ্গীতমুখর—কেননা আমার দেশ গড়া হয়েছে শান্তি দিয়ে। অর্থাৎ, এই মানুষটির সুখ অন্যান্য মানুষের সুখের ওপরে নির্ভরশীল। 'শান্তি' শব্দটি বিশেষভাবে সুন্দর; অতি পরিচিত এই কথা, তবু এতে রয়েছে এক নতুনত্বের ছাপ; কেননা এমনি করে এ কথাটাকে আগে কেউ কোনোদিন ব্যবহার করে নি। 'আকাশ, আমার গাঢ়তর নীল আকাশ'ও সুন্দর, কেননা তা উচ্চারিত হচ্ছে এক আশ্চর্য নম্রতায়। কবির প্রয়োজন শুধু 'নীল' কথাটি, আর যেই ব্যবহৃত হলো কথাটি অমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশ। এবং ভারী সুন্দর এই কবিতাটির ছন্দ, এতে রয়েছে এক বিশাল তৃপ্তির প্রতিভাস। এমন কি, না বুঝেও যদি তোমরা এ কবিতাটিকে পড় তাহলেও তোমরা বুঝবে আমার কথার মর্ম; এবং বিশেষভাবে সহজ হয়ে উঠবে সমস্ত ব্যাপারটা যদি তোমরা এটাকে গেয়ে ওঠ আইসলারের দেওয়া সুন্দর সুরে।

আশা করছি, খানিকটা চুলচেরা বিচার করে এ কবিতার কোনো রসহানি ঘটাই নি। গোলাপ তার সম্পূর্ণতায় সুন্দর, তবু তার প্রতিটি পাপড়িরও সৌন্দর্য আছে। আমি বিশ্বাস করি, যদি ঠিকমত কবিতা পড়া যায় তাহলে কবিতা সত্যিই তৃপ্তির খোরাক হয়ে উঠতে পারে।

অনুবাদ: দিলীপ ঘোষ

ব্রেখ্‌ট-এর জীবনপঞ্জী

১৮৯৮ : আউসবুর্গ শহরে জন্ম। পরবর্তীকালে ব্রেখ্‌ট একটি কবিতায় লিখেছেন, "একটি সম্পত্তিপন্ন পরিবারের সন্তান হিসেবে যতই বড় হতে থাকি ততই আমার নিজের শ্রেণীর লোকদের প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়তে থাকে।"

১৯১৩-১৯১৭ : আউসবুর্গ জিমনাসিয়ামের ছাত্র থাকাকালীনই তরুণ ব্রেখ্‌ট-এর কবিতা, গল্প এবং বিভিন্ন রচনার প্রকাশনা শুরু।

১৯১৭ : মিউনিক শহরে প্রকৃতিবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন।

১৯১৮ : কিছুদিন সৈন্যবিভাগে নার্সের কর্মভার গ্রহণ। এই সময়ে তিনি "মৃত সৈনিকের কাহিনী" কবিতাটি লেখেন। বিপ্লবের সময় আউসবুর্গ সৈনিক পরিষদের সদস্য হন। "বাল" (Ball) নাটক রচনা এবং বিভিন্ন শহরে তা মঞ্চস্থ হয়।

১৯১৯-১৯২৫ : নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন। মিউনিক শহরে ১৯২২ সালে "অন্ধকারের বাজনা" নামক মিলনান্তক নাটক এবং ১৯২৩ সালে "শহুরে জঙ্গলে" নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। অতঃপর ব্রেখ্‌ট মিউনিকের এক নাট্যগৃহের সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং তাঁর অধ্যয়নে ক্ষণিক ছেদ পড়ে। নাৎসীদের বন্দীপরিকল্পনার তালিকায় ব্রেখ্‌ট-এর নামও অন্তর্ভুক্ত হয়।

মারলোর ঐতিহাসিক পুস্তক অবলম্বনে এবং লিও ফয়েশ্টভাগনারের সহযোগিতায় ঐতিহাসিক নাটক "ইংলন্ডের দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের জীবনী" রচনা করেন এবং তা ১৯২৪ সালে মিউনিক শহরেই প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

মাক্স রাইনহার্ড্‌ট্‌ ব্রেখ্‌টকে তাঁর জার্মান থিয়েটারে আমন্ত্রণ করেন। অতঃপর ব্রেখ্‌ট বার্লিন শহরে যান। এই সমস্ত বছরগুলি সম্পর্কে পরবর্তীকালে ব্রেখ্‌ট লিখেছেন, "...আমি রুশদেশের বিপ্লব সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে তখন কিছুই জানতাম না কিন্তু সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগে কাজ করার সুবাদে ১৯১৮ সালের শীতকালে আমি এটা অনুভব করতে শুরু করলাম যে বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণী একটি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকারের এবং নতুন দৃষ্টিসঞ্জাত এক সংগ্রামের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে।"

১৯২৬ : ব্রেখ্‌ট কর্তৃক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন। মার্কসীয় শ্রমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন। কৌতুক নাটক "মানুষের মতো মানুষ"-

এর প্রথম অভিনয় ডার্মস্টাটে। বার্লিনে প্রথম অভিনয় গণরঙ্গমঞ্চে, ১৯২৮ সালে। দ্বিতীয় অভিনয়—বার্লিন স্টাট থিয়েটারে, ১৯৩০ সালে।

১৯২৭ : 'বাল' নাটকটি লেখার পরে 'অন্ধকারের বাজনা', 'ইংলন্ডের দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের জীবনী' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এরপর 'শহুরে জঙ্গলে', 'মানুষের মতো মানুষ' এবং 'দি হাউসপোস্টিলে' নাটক এবং কবিতার একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়।

১৯২৮ : 'তিন পয়সার পালা'-র প্রথম অভিনয়, বার্লিনের রঙ্গমঞ্চে।

১৯২৮-১৯৩১ : অনুষ্ঠানলিপি—"শহর মেহাগানির উত্থান ও পতন" পালা (সঙ্গীত : কুর্ট ভাইল), "বাডেনের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে মতৈক্য," " 'হাঁ' মহাশয় এবং 'না' মহাশয়" পালা। "উপযুক্ত ব্যবস্থা" নামক শিক্ষামূলক নাটকটির বার্লিনে প্রথম অভিনয় ; সঙ্গীত : হান্স আইস্লার।

১৯৩২ : 'মা' (গোর্কির উপন্যাস অবলম্বনে), অভিনয়াংশে আর্নস্ট বুস এবং হেলেন ভাইগেল। 'যুদ্ধক্ষেত্রে পবিত্র ইওহান্না' জার্মানিতে উত্তরোত্তর ফ্যাসিবাদী আবহাওয়া সৃষ্টির বিষয় অবলম্বনে রেডিও নাটক হিসাবে রচিত।

১৯৩৩ : হিটলারী দাপটে দেশত্যাগ করে ব্রেখ্ট প্রথমে যান ডেনমার্কে, পরে সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডে এবং ১৯৪১ সালে যান ক্যালিফোর্নিয়ায়। প্রবাসে থাকাকালীন 'স্থূলবুদ্ধি সূক্ষ্মবুদ্ধি' নাটকটির প্রথম অভিনয়।

বিশ্ব-সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে প্যারিসের আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে ১৯৩৫ সালে ব্রেখ্ট নিম্নলিখিত ভাষণ দেন : "...বন্ধুগণ, আজ আমাদের সামনে যে বিপদ উপস্থিত হয়েছে সেই বিপদের মূল সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে।......সেই চিন্তাধারাই আমাদের দেখাচ্ছে যে বর্তমান পৃথিবীর বিপদের মূল কারণটাই হচ্ছে সম্পদের মালিকানা-সম্পর্ক। এই মহৎ শিক্ষা অন্যান্য মহৎ শিক্ষার মতোই আজ মানবসমাজকে প্রভাবিত করছে, মানবসমাজ এই সম্পদ-মালিকানা সম্পর্কের বর্বর পদ্ধতির দ্বারা আজ চরম নিগৃহীত হচ্ছে।"

১৯৩৩-১৯৪৭ : দেশান্তরী থাকাকালীন প্রধান রচনাবলী : "সত্যকথা লেখার পাঁচটি প্রতিবন্ধক","তিন পয়সার উপন্যাস","তৃতীয় রাইখের ভয় এবং দুর্দশা", "শ্রীমতী কারার-এর রাইফেল" নাটক, "মাদার কারেজ এবং তাঁর পুত্রকন্যাগণ" (ত্রিশ বছরের যুদ্ধের উপাখ্যান-নাটক), "লুকুলুসের জবানবন্দী" (রেডিও নাটক) ; এই নাটকটি অবলম্বন করে পাউল দেসাউ পরবর্তীকালে "লুকুলুসের শাস্তি" পালাটি রচনা করেন। ১৯৩৮ সালে প্রফেসর হান এবং তাঁর সহকর্মীদের

দ্বারা পরমাণু বিভাজনের সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ব্রেখ্ট "গ্যালিলেও-র জীবনী" নাটকটি রচনা করেন। "সেৎজুয়ানের মহান মানুষটি" নাটক, "পুণ্টিলা মহাশয় এবং তাঁর ভৃত্য মাত্তি" সাধারণের জন্য লিখিত নাটক, "আর-তুয়ো উই-র প্রতিরোধ্য উত্থান" নাটক, "জুলিয়াস সীজারের কাহিনী" ছোট উপন্যাস। "সিমোনে ম্যাকার্ডের কাহিনী" লিও ফয়েস্ট-ভাগনারের সহযোগিতায় লিখিত; "ককেশীয় চক্ সার্কেল" নাটক, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সভেক" নাটক সহ বহু কবিতা ও প্রবন্ধ এই সময়কালে লিখিত হয়।

দেশান্তরী থাকাকালীন প্রকাশনা—'সঙ্গীত, কবিতা এবং সমবেত সংগীত'—প্যারিস, ১৯৩৪; "তিন পয়সার উপন্যাস"—আমস্টারডাম, ১৯৩৪; "রচনাবলী সংকলন" (দুই খণ্ডে)—প্রাগ—লণ্ডন, ১৯৩৪; "সভেন্টবোগা'র কবিতাগুচ্ছ"—লণ্ডন, ১৯৩৯; "তৃতীয় রাইখের ভয়এবং দুর্দশা"—নিউইয়র্ক, ১৯৪৬; এ ছাড়া পত্র-পত্রিকায় বহুবিধ রচনাও প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে ব্রেখ্ট মস্কো থেকে প্রকাশিত "Das Wort"-এর সহপ্রকাশক. হিসাবে কাজ করেন।

দেশান্তরী থাকাকালীন নিম্নলিখিত নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়: 'মা'—নিউইয়র্ক, ১৯৩৫; 'স্থূলবুদ্ধিএবং সূক্ষ্মবুদ্ধি'—কোপেনহেগেন, ১৯৩৬; 'শ্রীমতীকারার-এর রাইফেল'—প্যারিস, ১৯৩৮; 'তৃতীয় রাইখের ভয় এবং দুর্দশা'—প্যারিস, ১৯৩৮; মাদার কারেজ ও তার পুত্রকন্যাগণ'—জুরিখ, ১৯৪৩, 'তৃতীয় রাইখের ভয় এবং দুর্দশা'—নিউইয়র্ক, ১৯৪৫; 'গ্যালিলেও-র জীবনী'—'বেভারলী হিল' ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউইয়র্ক, ১৯৪৭।

১৯৪৭ সালে ইয়োরোপ থেকে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তনের পর "অমার্কিনী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটির" সামনে ব্রেখ্টকে হাজির হতে হয়।

১৯৪৭-১৯৫৬: 'আন্টিগোনে'র নাট্যরূপদান—ব্রেখ্ট ও কাশপার নেহের; প্রথম অভিনয়—চুরে (সুইজারল্যাণ্ড), ১৯৪৭; "পুণ্টিলা মহাশয় ও তাঁর ভৃত্য মাত্তি'র জুরিখে প্রথম অভিনয়, ১৯৪৮।

১৯৩০ সালে ব্রেখ্ট তাঁর বিভিন্ন সময়ে লিখিত বিষয়গুলি 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' নামে একটি বিশেষপত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন, কিন্তুএই প্রকাশনার কাজ ১৯৩৩ সালে নাৎসীদের ক্ষমতা লাভের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে, ১৯৪৯ সালে এই পত্রিকার নবম সংস্করণে আবার ব্রেখ্ট-এর প্রকাশনা শুরু হয়। নাটক ছাড়াও

'পরীক্ষা-নিরীক্ষায়' প্রকাশিত হয়েছে 'কেউনার মহাশয়ের গল্প'; 'শহরবাসীদের পড়ার বই' এবং মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নাটকের মূল্যায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন মৌলিক রচনাবলী।

হান্‌স্‌ আইসলারের সহযোগিতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্গীত রচনা।

'কুলে ভাম্পে' চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ; সঙ্গীত: হান্‌স্‌ আইসলার; প্রযোজনা: শ্লাটান ডুডভ; অভিনয়াংশে: আর্নস্ট বুস এবং হার্থা থিয়েল। 'আগে চলো এবং ভুলো না' সঙ্গীতটি এই ছবির জন্য ব্রেষ্‌ট রচনা করেন।

১৯৫২-৫৩ সালে শেকস্‌পীয়রের 'কোরিওলান' অনুবাদ এবং নাট্যরূপদান।

১৯৫৩ সালে "Turandot oder Der Kongress der Weisswascher" হাস্যকৌতুক রচনাটির প্রথম অংশ রচনা সম্পূর্ণ।

প্রকাশনা: "একশত কবিতা" ১৯৫১ সালে; থিয়েটার বিষয়ক রচনা "Theaterarbeit" ১৯৫৩ সালে; ১৯৫৩ সালেই বিভিন্ন রচনাবলীর "সংকলন"-এরও প্রকাশনা শুরু।

জার্মানির বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে ব্রেষ্‌ট-এর নাটক মঞ্চস্থ এবং অনূদিত হতে থাকে।

১৯৫৪ সালে 'লেনিন পুরস্কার' লাভ।

১৯৫৬ সালে ১৪ই আগস্ট বার্লিনে ব্রেষ্‌ট-এর জীবনাবসান। তাঁর সর্বশেষ বাসস্থানে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সরকারের আনুকূল্যে ব্রেষ্‌ট মহাফেজখানা স্থাপিত হয়েছে; এটি প্রকৃতপক্ষে বার্লিনের জার্মান শিল্প একাডেমী এবং জার্মান বৈজ্ঞানিক একাডেমী কর্তৃক ব্রেষ্‌ট-এর সমগ্র রচনাবলীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে নিয়োজিত।

সংকলক: অমল মুখোপাধ্যায়